আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
এবং হিউম্যানিস্টস্
অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র
বইমেলা বিশেষ সংখ্যা ২০০৯

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন

সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল

দাম : পঁচিশ টাকা

উপদেষ্টা : প্রবীর ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস :
ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি
৭২/৮ দেবীনিবাস রোড, কল-৭৪
ফোন : ২৫৫৯-০৪৩৫

হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন
পি ২, ব্লক বি, লেকটাউন কলকাতা-৮৯
ফোন : ২৫২১-৬২৭০

সূচি

সম্পাদকীয়/৩

চয়ন :
বাঙালি মধ্যবিত্ত/৫

প্রচ্ছদ নিবন্ধ :
জঙ্গলমহল থেকে ঘুরে/১১
লালগড় আদিবাসী আন্দোলন/২১
ব্রাত্যজনের রোদন সঙ্গীত/২৫
ছত্তিশগড় : একটি রিপোর্ট/৪১

প্রবন্ধ :
দাবি : সামগ্রিক উন্নয়ন/৪৬
সুস্থ কাম/৫২
হোমিয়প্যাথি/৬০
অচেনা রবি/৬৩
একটি ভূতের কাহিনি/৬৯
আমেরিকা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন/৭৬
যাত্রা নিয়ে দু'চার কথা/৭৯
অপরাধী চিনতে/৮২

বিজ্ঞান :
বিগ ব্যাং নিয়ে গবেষণা/৮৭

সংগঠন সংবাদ : /৯১

চিঠিপত্র : /৯৪

"ড্রাগস্ অ্যান্ড কসমেটিকস্' আইনের সংশোধনে ২২ জানুয়ারি ২০০৯ স্বাক্ষর করলেন রাষ্ট্রপতি। শাস্তি কমপক্ষে ১০ বছর জেল ও কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা জরিমানা।

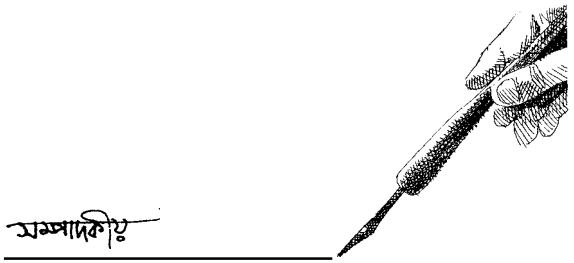

সন্ত্রাস বন্ধ করতে কালা কানুন

যদি সন্ত্রাস দমনের কড়া আইন থাকত, তবে ২৬ নভেম্বর মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলাই হত না। এমন একটা কড়া আইন ছিল না, তাই মুম্বইয়ের গণহত্যা বন্ধ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল সেনা, পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ, নৌসেনা, কাস্টমস্ ডিপার্টমেন্ট থেকে কমান্ডোরা পর্যন্ত। তেমন একটা কড়া আইন থাকলে ওরা তিনজন সন্ত্রাসবাদী পারত আমাদের দু'হাজার পুলিশ-সেনা এবং তিনশো কমান্ডোকে ৬০ ঘণ্টা ধরে নাস্তানাবুদ করতে?

এবার থেকে যেন সন্ত্রাসবাদীদের হাতে আর নাস্তানাবুদ না হতে হয়, তাই কড়া কানুন লোকসভায় গৃহীত হল। অভূতপূর্ব তৎপরতার সঙ্গে 'জাতীয় তদন্ত সংস্থা বিল ২০০৮' ও 'বেআইনি কার্যকলাপ (নিরোধক) আইন সংশোধনী বিল' দু'টি ১৭ ডিসেম্বর ২০০৮ বিনা বাধায় লোকসভায় পাশ হয়েছে। ইউপিএ সরকার (কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকার) সাথী হিসেবে বিজেপি থেকে সিপিএম, সিপিআই সবার সমর্থন পেয়েছে।

এবার আমরা মহান ভারতের দেশবাসীরা নিশ্চিন্ত হলাম—রাষ্ট্র ও সরকারের প্রাইভেট সেনারা ছাড়া আর কেউ সন্ত্রাস চালাতে পারবে না, এখন কী তাহলে কাশ্মীর থেকে মণিপুর, ছত্তিশগড় থেকে নন্দীগ্রাম সর্বত্র সরকারের খুল্লামখুল্লা সহযোগিতায় আরও ভয়ংকর সন্ত্রাসের থাবা নেমে আসবে!'

এই আইনে জঙ্গি বলে সন্দেহ হলেই যে কাউকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে। বিনা বিচারে আটকের মেয়াদ ৯০ দিন থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ১৮০ দিন।

নতুন আইনে 'সন্ত্রাস'-এর সংজ্ঞা কী? কোনও প্রকাশিত লেখা পড়ে প্রশাসন যদি মনে করে এ লেখা ভারতের নিরাপত্তা, জাতীয় সংহতি ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে

বিপজ্জনক, তবে লেখক ও প্রকাশককে 'সন্ত্রাসবাদী' বলে চিহ্নিত করা যাবে। অতএব সাদাকে 'সাদা' ও কালোকে 'কালো' বলার স্পর্ধা দেখান মানুষ, সাবধান! দেখবেন, যে-কোনও দিন সন্ত্রাসবাদী বলে গ্রেপ্তার হয়েছেন অরুন্ধতী রায়, মহাশ্বেতা দেবী, সুহেল শেঠ, কিরণ বেদী, অপর্ণা সেন বা শাঁওলী মিত্র।

কারও কাছে অস্ত্র বা বিস্ফোরক পাওয়া গেছে বলে পুলিশ অভিযোগ এনে সন্ত্রাসবাদী বলে গ্রেপ্তার করতে পারে। অভিযোগ প্রমাণের কোনও দায় থাকবে না নতুন আইনে। অভিযুক্তকেই প্রমাণ করতে হবে, সে নির্দোষ।

এমন কালাকানুন শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসই বাড়াতে পারে। আর এই সন্ত্রাসই পাল্টা সন্ত্রাসের জন্ম দেবে, ইতিহাস তাই বলে।

এই কালা কানুন সরকারকে শেষ তক্ বাতিল করতেই হবে। আন্দোলন, ধর্মঘট, অচল করার মধ্য দিয়েই অচল করা হবে দেশদ্রোহীদের জনবিরোধী আইন।

আনন্দবাজার পত্রিকা

৩০ ডিসেম্বর ২০০৮

ভারতীয় সেনাদের আর চাই না

কিনশাসা, কঙ্গো

অনেক হয়েছে, ভারতীয় সেনাদের আর চাই না। শান্তিবাহিনী পাঠাতে চান পাঠান, কিন্তু ভারতীয়দের বাদ দিয়ে অন্য দেশ থেকে পাঠান।— রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর অনুরোধ। কঙ্গোয় সরকার বনাম জেনারেল এনকুন্ডার নেতৃত্বে সরকারবিরোধীদের তীব্র সংঘর্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাহত, গৃহহীন। ৪৪টি কমিউনিটি গ্রুপ রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করায়, রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে কয়েক হাজার সেনা-সংবলিত শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানো হয়। তার মধ্যে যে ভারতীয়রা প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা নাকি স্থানীয় সোনা লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদিতে সিদ্ধহস্ত। কঙ্গো সরকারের মতে, মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে ক্রমাগত অভিযোগ করছেন ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে। অভিযোগের কিয়দংশও যদি সত্যি হয়, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের মাথা হেঁট হল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, তাঁরা দ্রুত তদন্ত করবেন, অপরাধ প্রমাণিত হলে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।

মধ্যবিত্ত বাঙালি

প্রবীর ঘোষ

'মধ্যবিত্ত' বলতে আমরা বুঝি মাঝারি আয়ের এটি জনগোষ্ঠীকে। কিন্তু 'বাঙালি মধ্যবিত্ত' বলতে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ 'মধ্য আয়ের বাঙালি'কে বোঝে না। বোঝে 'মধ্য আয়ের শিক্ষিত বাঙালি'কে। এই শ্রেণি-বিন্যাসের উৎপত্তি ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ফল। পাশ্চাত্যে 'জেন্টলম্যান' বলে একটি শ্রেণি আছে। অভিজাত বংশের শিক্ষিতদের বলা হয় 'জেন্টলম্যান'। অভিজাতের ঐতিহ্য আছে কিন্তু অবস্থা পড়ে গেছে এমন শিক্ষিতদেরও 'জেন্টলম্যান' বলে ডাকা হয়। এর বাইরে পাশ্চাত্যে 'আপার মিডিলক্লাস,' 'মিডিলক্লাস' এবং 'লোয়ার ক্লাস' নামে আরও তিনটি স্তরভেদ আছে। এই স্তরভেদ পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীদের করা।

আমাদের দেশের সমাজবিজ্ঞানীরা অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য অনুসারী। সুতরাং তাঁরা বর্তমানে এই ভারতের এবং এই বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আয়ের ভিত্তিতে বিচার করেছেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে আবার তিনটি ভাগ ভাগ করেছেন—'উচ্চ মধ্যবিত্ত', 'মধ্যবিত্ত' এবং 'নিম্ন মধ্যবিত্ত'।

বাঙালি সমাজবিজ্ঞানীদের এই শ্রেণি বিন্যাস পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের বাঙালি শিক্ষিত সমাজের কাছে আদৌ জনপ্রিয় হয়নি। বাঙালি শিক্ষিতরা দুটি শ্রেণি বিভাজন করেছিলেন। এক : শিক্ষিত মধ্য-আয়ের মানুষ, দুই: মধ্য-আয়ের মানুষ। শিক্ষিত মধ্য আয়ের মানুষদের 'ভদ্রলোক' 'ভদ্রমহিলা' বলে সম্বোধন করার রেওয়াজ ছিল। যেমন "বাবা, এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তুমি নেই শুনে বললেন, ঘোষবাবু ফিরলে বোলো, স্টেশন মাস্টার চৌধুরিবাবু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এক ভদ্রমহিলাও ছিলেন।"

শিক্ষিত বাঙালি সমাজ একজন কেরানিবাবুকে সম্মান দিলেও তাঁর চেয়ে বেশি আয়ের দোকানদারকে 'বাবু' সম্বোধন করতেন না, এখনও করেন না। এমনকি 'তুমি' বা 'তুই' সম্বোধনে অভ্যস্ত।

এখনও শিক্ষিত বাঙালিদের মধ্যে 'ভদ্রলোক' ভদ্রমহিলা, চৌধুরিবাবু, ঘোষবাবু ইত্যাদি সম্বোধন গ্রাম, আধাশহর ও মফস্সলে প্রচলিত আছে। শহর কলকাতার উত্তরে শ্যামবাজার, পাকপাড়া, হাতিবাগান, পূর্বে বেলেঘাটায় 'বাবু' সম্বোধন কিছুটা চালু আছে। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতা এবং সল্টলেকে 'মিস্টার, 'মিসেস' অনেক বেশি চালু সম্বোধন। এই পদবির পর 'ভদ্রলোক' বা 'বাবু' জুড়ে দেওয়া সম্বোধন,

'জেন্টলম্যান'-এর সমার্থক; 'পেটিবুর্জোয়া'র সমার্থক নয়। 'পেটিবুর্জোয়া' শুধুই 'মিড্‌ল ইনকাম গ্রুপ'। 'পুঁজিপতি' ও 'শ্রমিক' শ্রেণির মাঝখানের একটা গ্রুপ। শোষক ও শোষিতের মাঝের একটি শ্রেণি। এই শ্রেণিকে 'ভদ্রলোক' বা 'বাবু' শ্রেণির সঙ্গে মেলালে ভুল হবে। এই শিক্ষিত মধ্য-আয়ের 'বাবু' আর কোম্পানির আমলের বিদেশি সাহেবদের মুখে জমিদারদের 'বাবু' সম্বোধনেও আবার পার্থক্য আছে। এই বাবুদের কালচারে মিশে রয়েছে মদ-রক্ষিতা-বেশ্যা-পায়রা ওড়াতে টাকা ওড়ানোর মতো বহু পচা-গলা দিক—যাকে বলা হত 'বাবু কালচার'।

'মধ্যবিত্ত' সংজ্ঞা শুধুমাত্র আয়ের নিরিখে বিচার করত না বাঙালি। আর তাই একজন বঙ্গভাষী ফুটপাতের চায়ের দোকানি বা রিক্সাচালককে 'মধ্যবিত্ত বাঙালি' বলে মেনে নিতে পারেনি শিক্ষিত বাঙালি সমাজ।

এটা হয়তো ইংরেজ শাসনে দীর্ঘ সময় ধরে থাকার ফল। সত্যি বলতে কী ইংরেজ শাসনে সহযোগিতা করার জন্যে কেরানিকূল এবং পদস্থ ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালিরাই ছিল একচেটিয়া। সুতরাং ইংরেজদের কালচারের কিছু দিক এবং দাসসুলভ জোহুজুর-পনা ইংরেজদের চাকুরে বাঙালিদের প্রভাবিত করেছিল। ব্রিটিশরা উচ্চবংশজাত, শিক্ষিত গরিবদেরও 'জেন্টলম্যান' বলেন আজও। তাঁদের 'মিডল্ ক্লাস' শ্রেণিতে ফেলেন না। শিক্ষিত বাঙালিরা এই স্বভাব পেয়েছেন। তাঁরাও ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য জাতের লোককে 'ভদ্রলোক' বলে সম্বোধন করেন। শিক্ষার সম্মান জানাতে এটা বলেন। সম্ভ্রান্ত মুসলিমদের 'জনাব', 'সাহেব' ইত্যাদি সম্বোধন করেন। যে কোনো পেশার মানুষকে সম্মান জানাতে আজও বাঙালি কমিউনিস্টরাও পারেন না।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জৈষ্ঠ্য সংখ্যার 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয়—শিক্ষিত বাঙালি সম্প্রদায়। আসলে লেখাটি ছিল শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্তদের নিয়ে। কিন্তু পুরো রচনায় 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি একবারও ব্যবহৃত হয়নি। সেই সময়ের আশপাশে কোনো পত্রিকায় 'মধ্যবিত্ত বাঙালিদের সমস্যা' নিয়ে লেখা প্রকাশিত হয়নি। অথচ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছে শিক্ষিত বাঙালিদের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের (১২৯২ সন) ৯ ভাদ্র 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় 'বাঙ্গালির দারিদ্র্য' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে উকিল, ডাক্তার, বিজ্ঞানী প্রভৃতি শিক্ষিতদের জীবিকার ও তাদের সমস্যার কথা থাকলেও তাতেও 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

এইসব দেখে মনে হয়, সম্ভবত 'মধ্যবিত্ত' শব্দটি সে'কালে ব্যবহৃত হত না। 'শিক্ষিত বাঙালি' শব্দটি ব্যবহৃত হত। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না—'শিক্ষিত বাঙালি' শব্দটি, 'মধ্যবিত্ত বাঙালি' শব্দের বিকল্প হিসেবে সে' সময় ব্যবহৃত হত।

বাংলায় ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতি

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির আবির্ভাব তিনটি শহরকে কেন্দ্র করে, মাদ্রাজ, কলকাতা ও বোম্বাই। কলকাতা ছিল উভয় বঙ্গের সংস্কৃতির পীঠস্থান। কলকাতাকে ঘিরে বাংলার ও বাঙালির সংস্কৃতি আবর্তিত হতে থাকে।

ব্রিটিশ আমলে দুই বঙ্গের সর্বত্রই ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতি। কৃষিনির্ভর বাংলার পল্লি-সমাজে চন্ডীমণ্ডপের একটা বড় ভূমিকা ছিল। পল্লি-সমাজ চণ্ডীমণ্ডপের দ্বারা পরিচালিত হতো। পোস্টে আসা খবরের কাগজ পড়ার সময় গ্রামবাসীদের ভিড় কম হতো না।

ব্রিটিশ আমলে গ্রামবাসীর সংখ্যা ছিল ৯৫ থেকে ৯৩ শতাংশ। 'শহুরে কালচার' তখন যা চুঁইয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়াতো, তার উৎসস্থল ছিল কলকাতা।

'ভদ্রলোক', 'বাবু', 'বাঙালি মধ্যবিত্ত' শ্রেণির উৎপত্তি

লর্ড কর্ণওয়ালিশ জমিদারি প্রথায় চিরস্থায়ী রূপ দিতেই গ্রামীণ সংস্কৃতি পাল্টাতে শুরু করলো। জমিদার ও ধনী ভূস্বামীরা কোম্পানীকে রাজস্ব দেবে নগদ মুদ্রায়। রাজস্বের বিনিময়ে কৃষকদের চাষ করতে দেওয়ার ও তাদের জমি থেকে উৎখাত করার অধিকার ভারতের ভূস্বামীরা (Land holders) পাবে। কৃষকরা জমির মালিকানা হারালো। উঠে এলো দেশীয় সামন্তরাজ। এই নতুন সামন্তপ্রভুরা হলো—জমিদার, তালুকদার ইত্যাদি। ওরা চাষীদের বেশি শোষণ করে বেশি খাজনা আদায়ে যতটা তৎপর হলো, ততটাই চাষের প্রয়োজনে সেচ, রাস্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা নিয়ে নিস্পৃহ রইলো। এইসব খাজনার টাকায় বাবুগিরি শুরু করলো। এই বাবুরাই ব্যবসা ও সুদের কারবারে নামলো।

এইসব নব্যবাবুদের জমিদারি, ব্যবসা ও সুদের কারবারের কাজে প্রয়োজন হলো নানা শ্রেণির কর্মচারির। ইংরেজ প্রভু থেকে আদালতের কাজ সামলাতে ইংরেজিতে বলতে-লিখতে পারা কর্মচারির কদর বাড়লো। এই নব্য কর্মচারিরা পত্তন করলো বাঙালি 'ভদ্রলোক', 'বাবু' ও 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণির।

গত শতকের 'মধ্যবিত্ত সমাজ'

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণি'তে পড়তেন—শিক্ষক, অধ্যাপক, সরকারি কেরানি, মার্চেন্ট অফিসের কেরানি, চা বাগানের বাবু, রেলের টিকিট চেকার থেকে গার্ড, উকিল, ডাক্তার ইত্যাদি মাঝারি আয়ের শিক্ষিত পেশার মানুষরা। আয়ের পার্থক্যে মধবিত্তদের কেউ টানাটানির মধ্যে সংসার চালাতেন, তো কেউ ছিলেন স্বচ্ছল। তখনকার ডাক্তারবাবু'রা বেশিরভাগ-ই ছিলেন খুব জোর এম বি বি এস। গত শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকের খড়্গপুরের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডাক্তার 'জগন্নাথ ডাক্তারবাবু' পাশ করা ডাক্তার ছিলেন না। ছিলেন কমপাউণ্ডার। তাঁর নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, পেশার প্রতি শ্রদ্ধা তাকে বড় মাপের ডাক্তার করেছিল। সে সময় অনেক এল এম এফ পাশ হাফডাক্তারবাবু ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন পরিবারের চিকিৎসক ছিলেন। পরিবারের প্রত্যেকের হাঁচি-কাশির খবরও থাকতো নখ-দর্পনে। সোসালিস্ট ডাক্তারদের যুগ তখনও আসেনি। তাঁরাই ছিলেন পরিবারগুলোর ধন্বন্তরি। তখনকার ডাক্তাররা এখনকার বেশিভাগ ডাক্তারদের মতো 'একশো শকুন মরে এক ডাক্তার' হয়ে ওঠেনি। তাই রোজগারের দিক থেকে উচ্চ মধ্যবিত্ত বা মধ্যবিত্তের বেশি ছিলেন না। আজকালকার ডাক্তারদের মতো মেডিসিন কোম্পানি এবং ডায়গোনোস্টিক সেন্টারের কমিশনে কালো-সাদা টাকায় কোটিপতি হওয়ার সুযোগও ছিল না। সমাজে সর্বগ্রাসী দুর্নীতিও ছিল না।

বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণ ভাবে আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল না। খান কয়েক চৌকি, চৌকির তলায় থাকতো টিনের বাক্স ও ট্রাঙ্ক। পোশাক ঝোলানোর জন্য আলনা, লেখা-পড়ার চেয়ার টেবিল, দেওয়ালে টাঙানো থাকতো আয়না, ঠাকুরের ছবি, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস, আবুল কালাম আজাদ, গান্ধিজী, বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি ও ক্যালেণ্ডার। ঘরের এক কোণে ছোট্ট জলচৌকির উপর কিছু ঠাকুর দেবতার ছবি ও আমপল্লব শোভিত ঘট। জমকালো আসবাব বলতে বিয়েতে পাওয়া খাট কাঠের আলমারি ও ড্রেসিং টেবিল। একটা গ্রামোফোন বা রেডিও থাকা মানে যথেষ্টর বেশি। ফি শনিবার দুপুরে পাড়ার মেয়ে বউরা আড্ডা জমাতেন রেডিও-বাড়িতে। আসল উদ্দেশ্য—'অনুরোধের আসর' শোনা। পরিবারের লোকেরা শুক্রবার রাতে শুনতেন নাটক।

স্কুলে পড়তো পরিবারের তিন-চারটি ছেলে মেয়ে। নামমাত্র মাইনে। প্রায় সব-ই বাংলা মাধ্যমের স্কুল। প্রাইভেট টিউটরের বালাই নেই। পরিবারের বড়রাই স্কুল পড়ুয়াদের সন্ধের সময় পড়াতে বসাতেন। আমরা অর্থাৎ আমি ও চার বোন পড়তাম মা'য়ের কাছে। ছেলে-মেয়েদের সন্ধের মধ্যে ফেরাটা ছিল পাক্কা নিয়ম।

পাড়ার বড়দের সামনে বিড়ি-সিগারেট টানার দুঃসাহস কোনও স্কুল-কলেজের

পড়ুয়া দেখাতো না। সুতির টাউজার্স ও সুতির সার্ট চলতো। ধুতির ভিতর সার্ট গুঁজে পরাও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। হাফপ্যান্ট-সার্ট ও শোলার টুপি পরে ডিউটিতে যেতে আমার বাবাকেও দেখেছি। টুইলের সার্ট মানে ভালো কিছু। চুল ছাঁটতে নাপিত আসতো বাড়িতে। বাড়ির পুরুষরা লাইন দিয়ে একের পর এক চুল ছাঁটতো। জুলপি রাখা তখন প্রায় নিষিদ্ধ। বড়দের গোঁফ রাখাটাই ছিল চল। নাপিত হাতের-পায়ের নখ পর্যন্ত কেটে দিত নরুন দিয়ে। বয়স্কারা সেমিজের উপর শাড়ি পড়তেন। সেমিজ হলো সায়া ও ব্লাউজের যৌথ রূপ। ব্লাউজ হতো যথেষ্ট দীর্ঘ। তার উপর শাড়ি কোমরের অনাবৃত অংশ দেখার সুযোগ ছিল না।

বিয়ে-অন্নপ্রাসন-শ্রাদ্ধে মধ্যবিত্ত সমাজে আসনে বসে খাওয়াবার চল ছিল। চেয়ারে বসে তক্তার টেবিলে খাওয়াবার প্রচলন তারও অনেক পড়ে। সে খাওয়াও ছিল সহজ-সরল। জল, ভাত, ভাজা, ছ্যাঁচড়া, ফুল কপি, বাঁধা কপি, পটল বা এঁচোড়ের একটা বড়জোর দুটো তরকারি, মাছ অথবা মাংস, চাটনি, পাঁপড় ভাজা, বোঁদে, দই, দু-এক রকম মিস্টি। এই ছিল হিন্দু বাঙালির মধ্যবিত্ত বাড়ির খাবার। বাটার চিকেন, ফিস ফ্রাই, চিলি চিকেন, বাটার পনির, শিককাবাব, কাশ্মিরী কাবাব, ভেটকি পাতুরি ইত্যাদি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেনুতে তখনও ঢোকেনি।

মুসলিম বাঙালি মধ্যবিত্তরা সে'সময় বিয়েতে খাওয়াতেন—জলি পরোটা, শাহি পরোটা, বিরিয়ানি, শাহি কবাব, কোপ্তা, রেজালা, সেঁয়াউয়ের পায়েস ইত্যাদি।

সে'সময় নিমন্ত্রণ বাড়িতে আত্মীয়-পড়শিরা পরিবেশন করে খাওয়াতেন। সেই আন্তরিকতা আজকের ক্যাটারিং-এর খাবার পরিবেশনে বা 'বুফে ডিনারে' পাওয়া যায় না।

মাঝে-মধ্যে আত্মীয়রা বেড়াতে আসতেন। দু-পাঁচ দিন থেকে যেতেন। আতিথেয়তা ছিল আন্তরিক। বড় পরিবারের কল্যাণে 'মধ্যবিত্ত বাঙালি'দের অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও অতিথিকে উদার হৃদয়ে গ্রহণ করার মতো কলজে ছিল।

তখন বর্ষার ব্যাঙের ছাতার মতো ব্যাঙ্ক গজিয়ে ওঠেনি। পোস্ট অফিসে টাকা জমাতেন তারা।

ফ্রিজের জমানা আসেনি। বঙ্গদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে-ই সপ্তাহে একদিন বা দু'দিন হাট বসতো। গত শতকের চারের দশকের শেষ থেকে পাঁচের দশকের গোড়ায় পুরুলিয়া জেলার আদ্রায় ছিলাম। সপ্তাহে একদিন হাট। বাড়িতে থাকতো টিন ভরা ঘি। আলু বেশি করে কিনে রাখা হতো। সঙ্গে কিছু মরসুমি সবজি। কাঁচা সবজি এক-দু'দিনেই শেষ। শীতের সময় প্রচুর বাঁধাকপি কিনে কেটে শুকিয়ে রাখা হতো। টমাটোর জ্যাম চিনেমাটির বড় বড় বয়মে ভরে রাখা হতো। মাঝে-মধ্যে বছর ষাটেক আগে নেমন্তন্ন বাড়িতে পুরুষদের খাওয়ার পর মহিলাদের খেতে বসার খারাপ প্রথা চালু ছিল। বাড়িতে এসে পাঁচ মিশেলি সামান্য কিছু মাছ বিক্রি করে

যেতো জেলে পাড়ার কেউ। শীতকালে রাতের খাবার ছিল ঝোলা খেজুরের গুড় বা ক্ষীর দিয়ে রুটি। রান্না করতেন মা। আর সব কাজেই সাহায্য করতেন গোপা মাহাতো। গোপাদা তারপর বাবার আদার্লির চাকরি পেতে বাড়ির কাজে যোগ দিল নিধাদা। একটি ঠিকে ঝি রোজ বাসন মেজে দিয়ে যেতো।

আমাদের পড়শিদের সকলেই আমাদের মতো মধ্যবিত্ত। সব বাড়িতেই সে সময় একজন বাসনমাজার ঝি ও একজন কাজের লোক থাকতো।

তখনও বাঙালি মধ্যবিত্তরা বেড়াতে যেতেন পুজোর বা শীতের ছুটিতে। তবে এখনকার মধ্যবিত্তদের মতো কাশ্মীর, গোয়া, সিমলা, মুসৌরি, দেরাদুন, পোর্টব্লেয়ার, কন্যাকুমারী, রাজস্থান বা হংকং, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, টোকিও ছিল না। তখন মধুপুর, দেওঘর, গিরিডি বড়জোর পুরী বা কাশী পর্যন্ত ছিল দৌড়। মোটরগাড়িতে বা প্লেনে ভ্রমণের চল ছিল না। ট্রেনেই ভ্রমণ করতেন ভ্রমণবিলাসী মধ্যবিত্ত বাঙালি।

বাঙালি জীবনে দুর্নীতি আনলো বিশ্বযুদ্ধ

বাঙালি মধ্যবিত্তরা অনেকেই এক সময় কলকাতায় থাকতেন বিশাল বাড়ির অংশ নিয়ে। 'বারো ঘর, এক উঠোন' উনিশ শতকের গোড়ার চিত্র। বাকি জীবনচর্চা ছিল মধ্যবিত্ত গণ্ডী মেনে। এখানে কলকাতা, আদ্রা, খড়্গপুর, বর্ধমান—সব এক।

গত শতকের চারের দশকের শুরুতেই জাপান ভারত আক্রমণ করলো। কলকাতা শহরে জাপানি বোমার আতঙ্ক ছড়ালো। ধনীরা কলকাতা ছেড়ে পালালেন মধুপুর, দেওঘর, গিরিডি, কাশী ইত্যাদি অঞ্চলে। বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ থেকে কলকাতার জীবীকার সন্ধানে আসা গরীব মানুষরা গ্রামে পালালেন।

১৯৪৩-এ মানুষের লোভে তৈরি হওয়া ভয়ংকর দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষ মারা গেলেন। চাল, ডাল, তেল সবই নেই। বাড়তি মোটা টাকার বিনিময়ে অবশ্য সবই মিলতো। এটাই হলো কালোবাজারের শুরুর ইতিহাস। ১৯৪৩ সালে সরকার তার কর্মচারিদের জন্য 'মহার্ঘ ভাতা' প্রবর্তন করলো। কালোবাজারের ফলে ধনী ব্যবসায়ীরা আরও ধনী হলো। গরীবরা মরলো। আর মধ্যবিত্তরা 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' করলো। 'উপরি' আয়ের সাহায্যে খরচ সামলাতে লাগলো। যা ছিল 'উপরি' তাই আজ মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বগ্রাসী দুর্নীতির শুরু। জ্ঞানীর চেয়ে দুর্নীতিগ্রস্থ ধনীরা আজ যে সম্মান পায় তারই পরিণতিতে রাজনীতিক-পুলিশ-প্রশাসন-অধ্যাপক-শিক্ষক-ইনকামট্যাক্সকর্মী-সেলট্যাক্সকর্মী-ডাক্তার-উকিল-ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ইত্যাদি পেশার প্রায় মানুষই দুর্নীতিগ্রস্ত। সৎ মানুষ আজ একান্তই ব্যতিক্রমী চরিত্র।

—প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...

জঙ্গলমহল থেকে ঘুরে এসে

বিপ্লব দাস

অফিস ছিল ঝাড়খণ্ডের ছোট্ট একটি জনপদে। সবেমাত্র ইস্তফা দিয়ে নিজের বাঁকুড়ার বাড়িতে এসে পৌঁছেছি। যুক্তিবাদী সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির মেইল এলো। লালগড় কাণ্ড নিয়ে একটি রিপোর্ট বানাতে হবে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিলাম শুরু থেকেই। এবার পকেটে মেইলের ফোটোকপি নিয়ে মোটরবাইকে জঙ্গলমহল চষে বেড়ানো শুরু হল।

যা যা দেখলাম শুনলাম কোনোটিই লিখে ব্যক্ত করা আমার মতো অপটু হাতে সম্ভব নয়। সব হারানো সেই গ্রাম্য বৃদ্ধার কথা কিংবা টাঙ্গি হাতে শবর সম্প্রদায়ের বালকটির কথা বলব কীভাবে ভাবছি।

৫ নভেম্বর : লালগড়ের ডায়েরি

গত ২ তারিখ শালবনিতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসোয়ানের কনভয়ে মাইন বিস্ফোরণের জেরে লালগড়ের ছোটপেলিয়া গ্রাম-সহ আরও কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানের নামে পুলিশ গ্রামের মহিলাদের নিগৃহীত করেছে এবং নিরীহ ছাত্রদের মাওবাদী বলে গ্রেফতার করায় এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। স্থানে স্থানে পথ অবরোধ, গাছ ফেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার খবর আসছে।

৮ নভেম্বর :

লালগড় কাণ্ডের জেরে লালগড় থানার আই সি-কে ছুটিতে পাঠানো হল। তবুও আন্দোলন কমার কোনো লক্ষণ নেই। উল্টে স্থানীয় বাসিন্দারা ঝিটকার কাছে মেদিনীপুর-লালগড় সড়কটিও কেটে ফেলেছে। যাদের কারণে আদিবাসীদের ধিকিধিকি ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের আকার পেয়েছে শালবনি কাণ্ডে ধৃত সেই তিন ছাত্রকে শর্তাধীনে জামিন দিল মেদিনীপুর সি. জে. এম. আদালত। লালগড়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে 'ভারত জাকাত মাঝি মাড়ওয়া' নামের একটি আদিবাসী সংগঠন। তবে আন্দোলনে আজ প্রথমবারের জন্য কোনো রাজনৈতিক দল সহমর্মিতা প্রকাশ করেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি অনিল শিকারিয়া এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দ আজ লালগড়ে এসেছিলেন।

১০ নভেম্বর :

মাওবাদী সন্দেহে আদিবাসী মহিলাদের ওপর পুলিশি অত্যাচার এবং ছাত্র গ্রেফতারের ঘটনার প্রতিবাদে 'ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি' আগামী ১৬ নভেম্বর বাংলা বন্‌ধের ডাক দিল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে সেদিন বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-পশ্চিম মেদিনীপুরে এই বন্‌ধের প্রভাব পড়বে।

১১ নভেম্বর :

১০ নভেম্বর রাতে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার রাজেশ সিংহের সাথে ভারত জাকাত মাঝি মাড়ওয়া-র জুয়ান গাঁওতার নেতা প্রবীর মুর্মু এবং অন্যান্যদের একটি বৈঠকে স্থির হয়েছিল পুলিশ বিকেল চারটের পর কোনো আদিবাসী গ্রামে ঢুকবে না, শালবনি কাণ্ডে ধৃতদের মধ্যে যে তিনজন ছাত্র রয়েছে তাদের নাম চার্জশিট থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে এবং অত্যাচারিত মহিলাদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি ভেবে দেখা হবে। যদিও লিখিত কিছু দেওয়া হয়নি। সবটাই ছিল মৌখিক প্রতিশ্রুতি। মাঝি মাড়ওয়ার নেতারাও জানিয়ে দেন দহিজুড়ি মোড়ের অবরোধ তুলে নেওয়া হবে। দহিজুড়ি মোড়ের অবরোধ হঠলে মেদিনীপুরের সাথে লালগড়ের যোগাযোগ নিরবিচ্ছিন্ন থাকবে এই আশা করে পুলিশ সুপার গভীর রাতে মেদিনীপুর ফিরে যান। কিন্তু আজ সকালে অবরোধ ওঠেনি। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে আদিবাসীদের ওপর নেতাদের নিয়ন্ত্রণ একদম নেই। উল্টে আরও কয়েকটি রাস্তা নতুন করে অবরোধের মুখে পড়ে, কোথাও বা রাস্তা কেটে গাছ ফেলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। এই মুহূর্তে ঝাড়গ্রামের সাথে বেলপাহাড়ি হয়ে বাঁকুড়ার দিকে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। বিনপুর, পরিহাটি, পুরুলিয়া কোনো রাস্তা খোলা নেই। ঝাড়গ্রাম শহরের মুখে নহরখালে আজ নতুন করে গাছ ফেলে পথ অবরোধ হয়। নামোজামদার কাছে ৯ নম্বর রাজ্য সড়কেও গাছ ফেলা হয়। লালগড়ে পানীয় জলের পাইপ কেটে দেওয়ায় এবং বিদ্যুৎ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় সেখানের অবস্থা দুর্বিষহ। এরকম কষ্টকর অবস্থার মধ্যেও আদিবাসীরা নতুন উদ্যমে লেগে পড়েছেন। প্রশাসনের ডাকা সর্বদল বৈঠক প্রত্যাখ্যান করে নিজেরা দলিলপুর মোড়ে একটি মিটিং করেন। সভায় উপস্থিতদের মাঝ থেকে দু'টি দাবি উঠে আসে। প্রথম, গত দশ বছরে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের শিকার হওয়া আদিবাসী এবং অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোকেদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। দ্বিতীয়, গত দশ বছরে মিথ্যা মামলায় ওই এলাকায় ধৃতদের নিঃশর্ত মুক্তি এবং মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

১২ নভেম্বর :

রাজ্য-রাজনীতিতে সিপিএম আবার ধাক্কা খেল। সিঙ্গুরের তাপসী মালিক হত্যাকাণ্ডে সুহৃদ দত্ত এবং দেবু মালিককে চন্দননগর মহকুমা আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আজ।

এদিকে টানা সাতদিন অবরুদ্ধ জঙ্গলমহল। আজ শালবনি-রামগড় রাস্তায় নতুন করে অবরোধ শুরু হয়। ঝাড়গ্রাম শহরে ঢোকার মুখে আবার গাছ ফেলা হল। ফলে ঝাড়গ্রামের সাথে জামবনি, চন্দ্রি, লোধাশুলির যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।

আন্দোলন শুধুমাত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে সীমিত রয়েছে ভাবলে ভুল হবে। কেননা সকালবেলা গোয়ালতোড়-সারেঙ্গা রাস্তার অবরোধ দেখলাম। গোয়ালতোড় থেকে আসা লোক যেমন ছিল তেমনি পার্শ্ববর্তী জেলা বাঁকুড়ার সারেঙ্গা থেকে অনেক লোক অবরোধে সামিল হয়েছিল। এর থেকেই জেলা পুলিশ প্রশাসন আশঙ্কা করছে ১৬ নভেম্বর জঙ্গলমহলে ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির বন্ধকে ঘিরে উত্তেজনা হতে পারে।

১৩ নভেম্বর :

ঝাড়খণ্ড পার্টি নয়, মাঝি মাড়ওয়া নামের উপজাতীয় সংগঠন নয়, তাদের আন্দোলনকে জোরদার করতে এবার একটি সর্বস্তরীয় সংগঠন করার প্রয়োজন বোধ করল আদিবাসীরা। সেই লক্ষ্যে লালগড়ের দলিলপুর মোড়ে একশোর ওপর আদিবাসী গ্রামের প্রতিনিধিরা হাজির হয়। মোট ১৬৫ জন সদস্য সমন্বিত 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি' গঠিত হল। প্রশাসনের কাছে পেশ করার উদ্দেশ্যে দশদফা দাবিও তৈরি হল। মাওবাদী সন্দেহে ধৃত গ্রামবাসীদের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, পুলিশ ও প্রশাসনের ক্ষমা ভিক্ষা, পুলিশ ক্যাম্প সরানো সমেত অনেক কিছুই এই দাবির মধ্যে রয়েছে যা প্রশাসনের পক্ষে কিছুতেই মানা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের অতিরিক্ত জেলাশাসক আর এরন ইজরায়েল।

এদিকে এক বছরের ওপর স্টাইপেন্ড বকেয়া থাকার ক্ষোভে বাঁকুড়া জেলা আদিবাসী সংগঠন সকাল থেকে বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। তাদের বন্‌ধ ঘিরে সারা জেলায় ছিল চাপা উত্তেজনা।

১৭ নভেম্বর :

ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির ডাকা গতকালের বন্‌ধ সফল। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর তো বটেই বর্ধমান, হুগলি, বীরভূমের অনেকাংশেও ব্‌ধের প্রভাব ছিল। বন্‌ধের বিকেলে বাঁকুড়ার তালডাঙরায় দিশম পার্টির সাথে সিপিএম সমর্থকদের সংঘর্ষে দু'পক্ষেরই বেশ কিছু সমর্থক আহত হয়। মজার ব্যাপার এই যে, এতে বেছে বেছে শুধুমাত্র দিশম পার্টির ৭১ জন সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়।

লালগড় আন্দোলনের জের রাজ্য-রাজনীতির বাইরে জাতীয় স্তরেও চলে গেছে। দিল্লি থেকে সনিয়া-রাহুল এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছেন। আন্দোলনও এক জায়গায় থেমে নেই। জঙ্গলমহলের সীমানা ছেড়ে আরও দূর অবধি বিস্তৃত হয়েছে।

২০ নভেম্বর :

আন্দোলনের জঙ্গিপনায় সামান্য ঢিলে পড়তেই প্রশাসন এবং স্থানীয় সিপিএমের কর্মীরা আদিবাসী সংগঠনগুলির সাথে অবরোধ তোলা নিয়ে আলোচনায় বসল। নেতাদের আশ্বাস পেয়ে প্রশাসনের তরফে কয়েকটি রাস্তায় গাছ সরানো হয়েছে এবং কাটা রাস্তা ভরাট করা হয়েছে। ঝাড়গ্রামকে স্বাভাবিক করা গেলেও লালগড়ের ৮৩টি গ্রাম এখনও অবরুদ্ধ। বেলপাহাড়ির অবস্থাও তথৈবচ। এলাকা থেকে পুলিশ ক্যাম্প এবং পুলিশ ফাঁড়ি সরানোর দাবিতে গ্রামবাসীরা সরব। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা লালগড়ে গিয়ে তাদের সাথে আলোচনায় না-বসলে এলাকায় পুলিশ বয়কট করা হবে বলে তারা জানিয়ে দেন। এরকম অশান্ত পরিবেশে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর হল দু'দিন আগে জঙ্গলমহলে ডিউটিরত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার এক পুলিশ অফিসার ডিউটি করতে রাজি না হয়ে চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ, খাতড়া, রায়পুর, সিমলাপাল, তালডাঙরা ব্লকের স্থানে স্থানে পথ অবরোধ, মিটিং মিছিলে জায়গাগুলি ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে।

২৪ নভেম্বর :

অবরোধের উনিশটি দিন চলছে। জঙ্গলমহলের হাল যেমনটি ছিল তেমনই। প্রশাসনের সাথে বার দুয়েক মিটিং এর পরেও কোনো সুরাহা হয়নি। তৃণমূল-বিজেপি-কংগ্রেস-সহ সব বিরোধী দল ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টায় লালগড় নিয়ে মিডিয়ার সামনে বক্তব্যের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে। লক্ষ্য আদিবাসী ভোট ব্যাঙ্ক। আর শ্যামল বিমান-বিনয়ের মতো বাম নেতারা এসবের পেছনে মাওবাদীদের দায়ী করছে আর গালি পাড়ছে। ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির ৭১ জনকে এখনও জামিন দেয়নি। ওদের মুক্তির দাবিতে পার্টি সমর্থকেরা বাঁকুড়া জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিতে যান। সাথে তৃণমূল, কংগ্রেস, এস.ইউ.সি.আই., সমাজবাদী পার্টির জেলাস্তরের নেতারা।

২৮ নভেম্বর :

মাত্র দু'দিন পর পশ্চিমবঙ্গের চারটি পুরকেন্দ্রের নির্বাচন রয়েছে। তার মধ্যে একটি কেন্দ্র ঝাড়গ্রাম। আসন্ন নির্বাচনকে মাথায় রেখে গত এক সপ্তাহ ধরে সিপিএম এমন কোনো সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না যাতে করে নির্বাচনের আগে বিরোধীরা কোনো ইস্যু পেয়ে যায়। আপাতত ধীরে চলো।

আদিবাসীদের উপর অত্যাচার-সহ তিনদফা দাবি সামনে রেখে ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য)-র আজকের বন্‌ধে তিনটি জেলা বিপর্যস্ত। আগামী কালও বন্‌ধ চলবে বলে শোনা যাচ্ছে।

৩০ নভেম্বর :

বিকেলে সিপিএমের মেশিনারিজ 'ওকে' সিগন্যাল দেওয়ায় শেষ বিকেলে জঙ্গলমহলের বহু জায়গায় সমস্ত সিপিএম ক্যাডার বাহিনী নামে অবরোধ তুলে দিতে। দক্ষিণ বাঁকুড়ার বনকাঁটা, ময়না, রেঙুর বাঁধ এলাকায় অ্যাকশনের পুরোভাগে জেলা সম্পাদক-সহ সিপিএমের তাবড় নেতারা ছিলেন। পুলিশ 'নিরপেক্ষ' থেকে পুলিশের ভূমিকা পালন করেছে।

৩ ডিসেম্বর :

ঝাড়গ্রাম পুরনির্বাচনে জয়ী বামফ্রন্ট। শহরে উল্লাস উৎসব কোনোটাই নেই। চলছে শুধু জঙ্গলমহল উদ্ধারের নানান প্ল্যান।

৭ ডিসেম্বর :

অবশেষে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটির সাথে বসল রাজ্য প্রশাসন। আন্দোলনকারীদের ১১ দফা দাবির মধ্যে ৮ দফা দাবি মেনে নেবে জানালো প্রশাসন। আন্দোলনকারীরাও অবরোধ তুলে নেওয়ার লিখিত সম্মতি দিল।

সংক্ষেপে এই হল অবরোধের এক মাসের চলচ্চিত্র। আন্দোলন এখনও চলছে। ডান-বাম রাজনীতির সাথে পুলিশ-সিআরপি মিলে একটি জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আপাত শান্ত মনে হলেও জঙ্গলমহলের আধ কোটি বাসিন্দার ক্ষোভ কখন কোনদিকে মোড় নেবে বোঝা খুব মুশকিল। এই যেমন গতকাল অর্থাৎ ১৩ ডিসেম্বর বান্দোয়ানে মাওবাদী মোকাবিলায় কর্তব্যরত জওয়ানদের সাথে গ্রামবাসীদের সামান্য বচসা গুলি পর্যন্ত গড়াল; গ্রামবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে জওয়ানদের একটি জিপ জ্বালিয়ে দিল।

ক্ষোভ এবং আদিবাসী সমাজ

ক্ষোভ! ক্ষোভ! তীব্র ক্ষোভ! কিন্তু কীসের জন্য? অনুন্নয়ন, অত্যাচার, সামাজিক, কোন বঞ্চনার শিকার হচ্ছে স্বাধীন ভারতের বাম রাজ্যের এতগুলি মানুষ? রাজনীতিক থেকে রিকশাওয়ালা সবাই বলছে অনুন্নয়ন এই ক্ষোভের মূল কারণ। সত্যিই কি তাই? জঙ্গলমহলের চেয়েও দরিদ্র গ্রাম, দরিদ্র জনগণ, দুয়োরানি ব্লক রয়েছে পুরুলিয়ার এক তৃতীয়াংশ অঞ্চলে। এমনকী খাস কলকাতার নিকটবর্তী সুন্দরবনেও দারিদ্র্য কম নেই। তাহলে? গোর্খা আন্দোলনের সাথে এর কি কোথাও মিল রয়েছে? উত্তর হল সবটাতে নয়, কিন্তু কোথাও কোথাও তো অবশ্যই। দুটোতেই অন্যতম কারণ প্রবল জাত্যাভিমান।

দু'হাজার তিন সালের ১৫ আগস্ট বাঁকুড়া জেলায় প্রথমবারের জন্য কোনো শবর গ্রামে স্বাধীনতার পতাকা উড়ল। ওরা শবর। ওরা সাপ, ব্যাং, ছুঁচো খায়। ওরা চোর-ছ্যাঁচোড়। এর বেশি কিছু দিতে পারিনি আমরা ভারতের এই প্রাচীন জাতিটিকে। জঙ্গলমহলের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী সাঁওতালরা বেশিরভাগই খেতমজুর।

বছরের দু'মাস ওরা খুব ব্যস্ত থাকে বাবুর খেতে ধান কাটায়। কী পায়? দিনে ৬০ টাকা আর একবেলা ভরপেট পান্তা। বাকি দশমাস? কিছু বলার প্রয়োজন আছে কি? কোড়া, ভূমিজ, মাহালি, মুন্ডা সব উপজাতিগুলিই সভ্য সমাজের চাপে শুকতলা হয়ে যেতে বসেছে। তাদের রীতি নীতি আধুনিক সমাজের চাপে আজ বিপর্যস্ত। অথচ ওদের সমাজ কাঠামো আমাদের চেয়ে অনেক মানবিক। গ্রামস্তরে মাজহি, জগ-মাজহি, পারানিক, জগ-পারানিক, গোডেথ এবং নায়কে—মোট ছ'জন থাকেন যারা বিচারব্যবস্থা, বিবাহ, গ্রামীণ সমস্যা, পূজা প্রতিটি কাজই সম্পন্ন করেন। এদের বাদ দিয়ে কোনো কাজ হয় না। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে পরগনা এবং কয়েকটি পরগনা নিয়ে ডিহরী সামাজিক দায়িত্বগুলি পালন করে থাকে। সবার ওপরে থাকে 'ল মহল'। এর নির্দেশ প্রতিটি স্তরে অবশ্য পালনীয়। আদিবাসীদের সমাজ পরিচালিত হয় যেভাবে তার সাথে সাম্যবাদী চিন্তাধারার মিল পাওয়া যায়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখনও সেখানে আধুনিকতার ছোঁয়া আসেনি তখনও তারা চাষ, গৃহ নির্মাণ, পশুপালন প্রভৃতি করত হাতে হাত মিলিয়ে পারস্পরিক সহায়তায়। এখনও কিছু কিছু জায়গায় এরকম রয়ে গেছে। শিকার করলে পাড়া প্রতিবেশী ভাগ করে খায়। শ্রম দান করেন পুরুষ-নারী নির্বিশেষে। খিদের জ্বালায় মরে গেলেও ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় নেয় না। সাঁওতাল সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে ভেদাভেদ নেই। স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবাদের পুনর্বিবাহে কোনো বাধা নেই। সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলে অতি অল্পে তুষ্ট হয়, সঞ্চয়ের ধার ধারে না। সারাদিনের রোজগার সন্ধের মধ্যেই ব্যয় করে ফেলে। সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজের জন্য নাচ, গান, বিবাহ প্রতিটি অনুষ্ঠানে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিই প্রধান।

স্বাধীনোত্তর ভারত এদের জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন এনে দিয়েছে। কিন্তু যা দিতে পারেনি তা হল সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা। আদিবাসীরা আদিবাসীই রয়ে গেছে। আদিবাসী কথাটির অর্থ আদিম অধিবাসী। কী সম্মান! কী গুরুত্ব! তাদের সংস্কৃতি নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করব, তাদের জীবনযাপনে আমাদের ইতিহাসকে খুঁজব কোথায়? আমরা সভ্য মানুষেরা আদিবাসী কথাতেই একটা ঘেন্না ঘেন্না অনুভব করি। চোখ বুজলে দেখতে পাই কতকগুলো কালো কুচকুচে হাড় জিরজিরে লোক জুলুজুলু চোখে তাকিয়ে রয়েছে। একুশ শতকের উপরি পাওনা আদিবাসী মানেই মাওবাদী। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের তিনটি প্রান্তিক জেলায় প্রশাসনিক তৎপরতা কোনো কালেই ছিল না। বাম জমানায় প্রশাসনিক কাজকর্মের ভার বকলমে সিপিএমের ওপরেই ন্যস্ত। সিপিএমের কর্মীরাই বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে যাবেন কেন টু পাইস না হলে? এর ফলে এ অঞ্চলে সিপিএম প্রভাব বহুদিনেরই। তিনটি জেলার বিধানসভার নব্বই শতাংশ আসন সিপিএমের দখলে। মাওবাদীরা যখন গ্রামগুলিতে গিয়ে গিয়ে তাদের প্রচার কাজ শুরু করল সিপিএমের কেন্দ্রীয়

থেকে লোকাল কমিটির মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গেল। মাওবাদী, লিঙ্কম্যান, সাপ্লায়ার ইত্যাদি বহু নামে ধরপাকড় শুরু হল। জঙ্গলমহলের প্রতিটি থানায় শক্তি বৃদ্ধি করা হল। গাদা বন্দুকের জায়গায় হাতে উঠে এলো এস.এল.আর., কার্বাইন। স্থানে স্থানে বসল পুলিশ, বিএসএফ, সিআর পি-র ক্যাম্প। কোনো একজন মাওবাদীর খোঁজে এসে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি থেকে পুরুষদের তুলে নিয়ে যায়। পুরুষ না থাকলে মহিলা তো রয়েইছে। আদিবাসী মহিলাদের দেহসৌষ্ঠব খারাপ নয়। আর জঙ্গলের ক্যাম্পে বসে বসে একাকী জীবনে একটু-আধটু ইয়ে আর কী! এমনিতেই তো এসব জায়গাকে ওনারা মনে করেন পানিশমেন্ট পোস্টিং। বড়বাজার, গড়িয়াহাট কিংবা বাংলাদেশ সীমান্তের রসালো পোস্টিং ছেড়ে কে বা এই জঙ্গলে ডিউটি করতে চায়? জঙ্গলের চোরাচালানকারী আর কাঠগোলাগুলি ছাড়া কেউ পোছে না যে!

হারমোনিয়ামের রিডের মতো বুকের খাঁচা নিয়ে পুলিশের জিপ আর ভারী বুটের আওয়াজ কতদিনই বা শুনবে কেউ। প্রতিবাদ হবে না তা কখনও হয়? ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম 'চুয়াড় বিদ্রোহের' জনক যারা, তারা প্রতিবাদ করবে না তো কে করবে? দীর্ঘদিনের অত্যাচারের প্রতিবাদ হল একটি ইস্যুকে কেন্দ্র করে। লালগড়।

উন্নয়ন :

সেদিন টিভিতে দেখলাম একদল আদিবাসী যুবক চিৎকার করে তাদের বঞ্চনার কথা বলছে। তাদের মধ্যে মাঝখানে দাঁড়িয়ে শার্টপ্যান্ট আর কালো রোদচশমা পরা যে ছেলেটি একটু লিডার গোছের, যার গলা বেশি শোনা যাচ্ছে বলছে, 'এইখ্যানে কারেন নাই, জল নাই, ইস্কুল নাই। সিপিএম কিছুই দেয় নাই, সবই তো নাই এর বাজার। কত দিন আর হাত গুঁটায়ে বস্যে থাইকব্য তার লেগ্যে টাঙ্গি ধর‍্যেছি।' শুনে মনে মনে হাসলাম আর বললাম ওরে বাছা সিপিএম জমানায় কিছুই কি পাসনি? এই যে রাস্তা, পাকাবাড়ি, ইস্কুল, টিউবওয়েল, সেচের জন্য খাল যেটুকু হয়েছে সবই তো বাম জমানায়। স্বাধীনতার তিরিশ বছরে কংগ্রেস জমানায় কিছুই তো ছিল না। যেটা পাসনি সেটা হল সমান উন্নয়ন। রাজ্যের বাকি অংশে টাকা ঢালার পর ছিটেফোঁটাটুকু তোদের পাতে পড়ে। সেটুকুও যদি সদ্ব্যবহার হত অঞ্চলের চেহারাটাই পাল্টে যেত। হচ্ছে না সিপিএমের চূড়ান্ত দুর্নীতি আর প্রশাসনিক গাফিলতিতে। এবার নির্বাচনে জিতে মুখ্যমন্ত্রী 'পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন' দপ্তর খুলে বসলেন। লক্ষ্য জঙ্গলমহলের উন্নয়ন। মহাকরণে দপ্তর রয়েছে ঠিকই, কিন্তু না আছে কর্মী না চেয়ার টেবিল। যেখানে সর্বোচ্চ পর্যায়ে এই অবস্থা তৃণমূল স্তরের কর্মীরা কি করে কাজ করবেন সহজেই অনুমেয়। ফল হল গত ২০০৬-০৭ আর্থিক বাজেটের ৪০ কোটি টাকার এক দশমাংশও খরচ হয়নি। অন্যান্য যে সমস্ত খাতে উন্নয়নের

টাকা আসছে তা শেষ পর্যন্ত মহাকরণ থেকে জেলা সদর, সদর থেকে মহকুমা, মহকুমা থেকে পঞ্চায়েত—এভাবে হাত বদল হতে হতে শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রধান কারণ অনুন্নয়ন না হলেও আন্দোলনে অনুঘটকের কাজ করেছে একথা অনস্বীকার্য।

আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি :

নভেম্বরের শুরুতে আন্দোলনের প্রথমদিকে সাঁওতাল সমাজের নিয়ম মেনে পাড়া থেকে গ্রাম, গ্রাম থেকে পরগনা আন্দোলন ছড়াচ্ছিল এইভাবে। ১০ নভেম্বর থেকে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক একটি সংগঠন যার নাম 'ভারত জাকাত মাঝি মাড়ওয়া' আন্দোলনের রাশ হাতে ধরে নেয়। তখনও আগুন লালগড়-ঝাড়গ্রামের বেশি ছড়ায়নি। ১১ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টি আসরে নামে এবং আন্দোলনটিকে সশস্ত্র এবং জঙ্গি রূপ দেয়। দিশম পার্টি মাঠে নামার পর ঝাড়খণ্ড পার্টি (চুনিবালা) এবং ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য) এই দু'টি রাজনৈতিক দলই তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। আদিবাসীদের মধ্যে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেসের যেসব কুচোকাচা কর্মী ছিল সবাই প্রবল জাত্যাভিমান থেকে জড়িয়ে পড়ে আন্দোলনে। নানান মতামত পরিবেষ্টিত নেতারা আন্দোলনকে সফল রূপ দিতে একটি অ-রাজনৈতিক মঞ্চ করার প্রয়োজন বোধ করলেন। সেই লক্ষ্যে ১৩ নভেম্বর গঠিত হল 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি'। এরপর থেকে এরাই নেতৃত্ব দিয়েছে আন্দোলনের। এই মঞ্চটি তৈরি করার পেছনে মাওবাদীদের মাথা ছিল বলে অনেকে মনে করেন এবং তারা এ-ও মনে করছেন যে, এই কমিটিকে সামনে রেখে মাওবাদীরাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কিন্তু এরকম মনে করার পেছনে যুক্তি ধোপে টিকবে না। ঝাড়খণ্ড পার্টির প্রধান আদিত্য কিস্কু, দিশম পার্টির নেতা সুশীল মাহাত এবং পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধীর নেতা কর্মীদের সাথে কথা বলে আমার যা মনে হয়েছে আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে আদিবাসীদের দ্বারাই চালিত। এরকম মনে হওয়ার কারণ হল আন্দোলনকারীদের মধ্যে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব যা বারে বারে দেখা গেছে। নেতারা হয়তো কথা দিলেন কাল সকালে অমুক জায়গায় অবরোধ তুলে নেওয়া হবে, কার্যক্ষেত্রে তা হয়নি। একবার দু'বার নয়, বারে বারে এটা হয়েছে। কিংবা আজ সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত হল, কাল সেটা কেউ মানছে না। এগুলো সবই আদিবাসী আন্দোলনের মৌলিক চরিত্র। 'পুলিশ সন্ত্রাস বিরোধী' মঞ্চে অনেক সিপিএম কর্মী ঢুকে পড়েছিল এই অজুহাতে যে তারা বিক্ষুব্ধ এবং আদিবাসী। আন্দোলনকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এই একটি ভুলই যথেষ্ট। কারণ ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে এরাই বেরিয়ে গিয়ে আন্দোলনের গতিকে স্তব্ধ করে এবং প্রতিরোধ কমিটিতে যোগ দেয়। মাওবাদীরা নেতৃত্বে থাকলে কোনোদিনই এরকম ছেলেমানুষী ভুল হত না। অবশ্য আন্দোলনকারীদের মধ্যে যেমন সিপিএম তৃণমূল সব দলের কর্মীরাই আছে তেমনি মাওবাদীরাও থাকতে পারে।

শেষ কথা :

বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রাম শহরে যেখানেই যুক্তিবাদী সমিতির কর্মীরা রয়েছেন আদিবাসীদের ওপর পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছেন এবং আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। স্থানীয়ভাবে সমিতির পত্রপত্রিকায় তুলে ধরছেন সামগ্রিক চিত্রটি। সমিতির তরফ থেকে আমি ২৩ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড পার্টি (আদিত্য) এবং ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতাদের জানিয়েছি পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে যুক্তিবাদী সমিতি আপনাদের সাথে আছে। তারা আমাদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী সমিতির 'স্ট্যান্ড পয়েন্ট' নিয়ে সাংবাদিকদের কাছে প্রবীরদা এবং সুমিত্রাদি বলিষ্ঠ মতামত দিয়েছেন তা আন্দোলনকারীদের আরও উজ্জীবিত করছে।

গত দেড় মাসের চাপান-উতোরে সাফল্য এসেছে অনেকখানি। যাঁদের গ্রেফতার করা নিয়ে এত কাণ্ড তাদের নাম মামলা থেকে বাদ দেওয়ার কথা ভাবছে সিআইডি। এর জন্য তারা আদালতে আবেদনও জানিয়েছে। মাওবাদী সন্দেহে গ্রেফতারের পর এভাবে মামলা প্রত্যাহারের সরকারি আবেদনকে 'নজিরবিহীন' বলেই মনে করছেন মেদিনীপুর আদালতের আইনজীবীরা। জেলাশাসক এবং অনগ্রসর কল্যাণ মন্ত্রকের কাছে আরও ২০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে কয়েকটি স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার জন্য। তড়িঘড়ি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করা হয়েছে। আরও কত বেলপাহাড়ি, বাঁশপাহাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া হয়েছে। পুলিশ অযথা আদিবাসীদের হয়রানি করবে না, রাতের বেলা খোঁজাখুঁজির নামে কারওর বাড়িতে ঢুকবে না, গেলেও সাথে গাঁয়ের মাতব্বরদের সাথে নিয়ে যাবে, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের মুক্তির ব্যাপারে সচেষ্ট হবে। লালগড় কাণ্ডে পুলিশি নিগ্রহের ঘটনার তদন্ত হবে এবং দোষী প্রমাণিত হলে পুলিশের শাস্তি হবে, স্কুল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়া হবে এবং ভবিষ্যতে বসানো হবে না। আদিবাসীদের প্রতিনিধি এবং প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গড়ে তোলা হবে। তারাই এলাকার উন্নয়ন এবং সমস্যা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা, সভা করবেন। আমাদের মহান মুখ্যমন্ত্রী ঘটনার দেড়মাস পর বুঝতে পারলেন পুলিশ সেদিন বাড়াবাড়ি করেছিল। ঠিক করেনি। সেজন্য উনি দুঃখিত এবং লজ্জিত একথা বলতেও ভোলেন নি। আমরা বরাবর জানি উনি খুব ভালো বোঝেন, তবে একটু দেরীতে এই আর কী!

প্রশাসনের এই ইতিবাচক পদক্ষেপ কত মাইল যাবে জানা নেই। হয়তো গোড়াতেই চারাগাছ শুকিয়ে যাবে। আবার শুরু হবে দমদম দাওয়াই, কেশপুর লাইনের মতো পরিচিত শব্দবাক্য। জঙ্গলমহল ধীরে ধীরে হয়ে উঠবে অশান্ত। এরকম ভাবার কারণ আছে। কেননা, আদিবাসীদের প্রতি রাজ্যবাসীর সহানুভূতির কাউন্টার

অ্যাটাক করতে ডিসেম্বর থেকে সিপিএমের ক্যাডার-গণসংগঠন-বুদ্ধিজীবী বাহিনীর মিলিত উদ্যোগে সর্বত্র একটা হাওয়া তোলা হচ্ছে আদিবাসীরা নাকি পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ করতে চাইছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে ঝাড়খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যই এত আন্দোলন। সরকারের পা-চাটা সংবাদমাধ্যমগুলি এই প্রচারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই ভয় হয়! আমরা বামপন্থী সরকারটিকে কম দিন তো দেখছি না। প্রথমে সেন্টুতে সুড়সুড়ি দিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে রাজ্যবাসী থেকে আলাদা করবে, তারপর দে আড়ং ধোলাই। তুমি যা জিনিস গুরু! আমরা সবাই জেনে গেছি।

কেরলে স্বেচ্ছামৃত্যুর আইনিকরণ নিয়ে সুপারিশ

তিরুঅনন্তপুরম ও কোচি, ১৪ জানুয়ারি : যদি রাজ্য আইন সংস্কার কমিশনের সাম্প্রতিকতম সুপারিশ অচ্যুতানন্দন সরকার মেনে নেয়, তাহলে বাম শাসিত কেরলই এদেশে প্রথম রাজ্য হবে, যেখানে স্বেচ্ছামৃত্যুর (মার্সি কিলিং) অনুমতি মিলবে। নতুন আইনে বলা হয়েছে, চিকিৎসক ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানে থাকা মরণাপন্ন কোনও রোগী তাঁর জীবন শেষ করে দিতে পারেন। আত্মহত্যার অধিকার নিয়ে সরব হওয়া এক বিশিষ্ট আইনজীবী ডি কে কৃষ্ণ আয়ার জানিয়েছেন, জীবন হচ্ছে এমন কিছু যার অর্থ রয়েছে। যখন সেই অর্থ চলে যায়, তখন স্বেচ্ছামৃত্যুই একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়ায়।

তবে রাজ্য আইন সংস্কার কমিশনের সাম্প্রতিকতম সুপারিশের বিরোধিতা করেছে কেরলের গির্জা। স্বেচ্ছামৃত্যুর বরাবরই বিরোধী গির্জা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, স্বেচ্ছামৃত্যুকে আইনি অনুমোদন দেওয়ার চেষ্টা হলে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এটা গির্জার শিক্ষা ও বিশ্বাসের পুরোপুরি বিরোধী। গির্জা মনে করে এই কাজ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী। মানবাধিকারের তিন নম্বর ধারায় মানুষের জীবনের মর্যাদার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কাজেই আইন সংস্কার কমিটির সুপারিশ তারা মেনে নেবে না। এখন দেখা যাক, কেরলের কমিউনিস্ট শাসকরা এই সুপারিশ মেনে নেয়, না সংখ্যালঘুদের চাপের কাছে গুটিয়ে যায়।

সৌজন্যে : দৈনিক স্টেটসম্যান ১৫ জানুয়ারি ২০০৯

লালগড়ে আদিবাসী আন্দোলন

অনিন্দ্যসুন্দর

"পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা"—একটি প্রচলিত প্রবাদ। পুলিশ সম্পর্কে এদেশের এক হাইকোর্টের মত হল, "পুলিশ সব থেকে সংগঠিত ডাকাতবাহিনী"। সেই পুলিশ-ই আপনাদের এলাকায় ঢোকার আগে আপনাদের অনুমতি নিচ্ছে...নিশ্চয়ই ভাবছেন আমি পাগল। পুলিশের হাজারো অন্যায় (যেমন—সামান্য এফ আই আর নিতেও অস্বীকার করা) দেখতে অভ্যস্ত আমাদের কাছে এই চিত্রটা এই মুহূর্তে লালগড়ের গ্রামবাসীদের কাছে বাস্তব। ৯ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের 'বর্তমান' এর সংবাদে তা প্রকাশিত। পিচ রাস্তা ছেড়ে মোরাম রাস্তা দিয়ে গ্রামে ঢুকতেই লালগড় থানার পুলিশবাহিনীকে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন আদিবাসীরা। ডি এস পি (অপারেশন) এবং অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) ফোনে আন্দোলনকারী 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'র নেতাদের কাছেই আবেদন জানান পুলিশকর্মীদের মুক্ত করার জন্য। কমিটির সম্পাদক সিধু সোরেন জানান, ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে দলিলপুরচকে এসে বৈঠক করার জন্য সাময়িকভাবে অবরোধ তোলা হয়েছিল। এবং নিরাপত্তার স্বার্থে পিচ রাস্তায় টহল দেওয়ার 'অনুমতি দেওয়া হয়েছিল' পুলিশকে। কিন্তু গ্রামের রাস্তায় যাওয়ার বা তল্লাশি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি।

আক্ষরিক অর্থেই বিপ্লব ঘটাচ্ছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী জনসাধারণ। সাথে রয়েছেন পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার আদিবাসীরাও। আন্দোলনকারীদের দাবি সামান্যই। অত্যাচারী পুলিশকর্মীদের শাস্তি দিতে হবে। পুলিশ সুপারকে ক্ষমা চাইতে হবে দলিলপুরে এসে। এই সামান্য দাবিটুকুও মেনে নিতে অস্বীকার করেছেন পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। অভিযুক্ত পুলিশকর্মীদের একজনকেও সাসপেন্ড পর্যন্ত করা হয়নি।

এই আন্দোলনের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাচ্ছে। এক এক করে তা বিশ্লেষণ করা যাক।

(১) কোনও রাজনৈতিক দল এই আন্দোলন সংগঠিত করেনি। সাহসী জনসাধারণের অভূতপূর্ব প্রতিবাদ-ই আন্দোলনকে অপ্রতিরোধ্য গতি দিয়েছে।

(২) নেতারা আন্দোলনকে ভুল পথে চালিত করলে তা চিহ্নিত করা এবং নেতাদের প্রতি আঙুল তোলার মতো সচেতনতা গ্রামবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

যা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যার ফলে আদিবাসী সমাজের মধ্যে একসময় গুরুত্ব পাওয়া মাঝিরা ('ভারত জাকাত মাঝি মাড়ওয়া' সংগঠন) পুলিশ-প্রশাসন ও সিপিএমের দালালি করতে গিয়ে গুরুত্ব হারিয়েছে। আন্দোলন চলাকালীন হঠাৎই অবরোধ তুলে নেওয়ার কথা বলে আন্দোলনকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরিণতিতে গড়ে উঠেছে 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'।

(৩) আন্দোলনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলা ও পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করছেন। এই একটি ঘটনাই প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট যে, সচেতনতার দিক থেকে তাঁরা শিক্ষার সুযোগ পাওয়া মানুষদের থেকেও অনেক এগিয়ে যাচ্ছেন।

(৪) লালগড়ের প্রতিটি গ্রামে ৫ জন মহিলা এবং ৫ জন পুরুষকে নিয়ে গঠিত হয়েছে গ্রাম কমিটি। গ্রাম কমিটি-ই গ্রামবাসীদের যাবতীয় সমস্যা মেটাবে। অত্যাচারী পুলিশ, নিষ্ক্রিয় প্রশাসন ও ঠুঁটো বিচারব্যবস্থার ভূমিকা এখানে শূন্য। এই ঘটনা ভারতে এক তৃতীয়াংশ জেলায় গড়ে ওঠা স্বয়ম্ভর গ্রামের কথা মনে করিয়ে দেয়।

(৫) ১৫ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার খবর—"কাটা গাছ ফেরত দিয়ে নজির জঙ্গলমহলের"। আন্দোলনের প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে যেসব গাছ কাটতে হয়েছিল অবরোধ উঠে যাওয়ার পর আদিবাসীরাই তা উদ্ধার করে বন দফতরের ডিপোয় ফিরিয়ে দিচ্ছেন। যে কাজ পুলিশ ও প্রশাসন কখনও পারে না। বরং কাঠপাচারকারী লরি ধরা পড়লে সেই কাঠ চেরাই করে সিপিএম নেতার বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। আদিবাসীরা এই দৃষ্টান্ত স্থাপনের পরও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক বিমান বসু বলেছেন, এটি চোরাকারবারীদের আন্দোলন। কাঠ চুরির উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন করেছে তারা। সম্ভবত সিপিএমের নিজস্ব সোর্সবাহিনী বিমানবাবুকে এই ঘটনার সংবাদ না দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

(৬) এ রাজ্যে সরকার-বিরোধী আন্দোলন পুলিশ দিয়ে দমন করাই রীতি। এই আন্দোলনের ক্ষেত্রেও সে চেষ্টা হয়েছিল প্রথম দিকে। কিন্তু তারপরের কয়েকটি ঘটনা ব্যতিক্রমী।—

২৬ নভেম্বর। রামগড়ের মোক্ষদাসুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আই আর বি জওয়ানদের ক্যাম্প তোলার দাবিতে আদিবাসীরা যখন মিছিল করছিলেন তখন "মিছিল শান্তিপূর্ণ হলেও সন্ত্রস্ত ছিলেন পুলিশকর্মীরা।" পরের দিন যা ঘটল পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তা প্রথম। রামগড়ের ওই ক্যাম্প তো বটেই, জঙ্গলমহলের আটটি ক্যাম্প ও দুটি ফাঁড়ি তুলে নিল পুলিশ। রামগড় পুলিশ ফাঁড়ির চাবি 'পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি'র সম্পাদক সিধু সোরেনের হাতে তুলে দিলেন ফাঁড়ির ইনচার্জ হীরক বিশ্বাস।

সাংবাদিক থেকে বুদ্ধিজীবী—সবাই দলিলপুর থেকে ঘুরে এলেও পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারা দলিলপুরে যেতে বারবার অস্বীকার করেছেন। পুলিশ ক্যাম্প তুলে নেওয়ার সময় শ'য়ে শ'য়ে পুলিশকর্মী ও জওয়ানরা নিরাপদে ফিরে এলেন। তারপরেও দলিলপুরে যেতে আন্দোলনকারী আদিবাসীদের কাছেই নিরাপত্তা চেয়েছে প্রশাসন। যা অত্যন্ত হাস্যকর এবং একইসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণও বটে।

জঙ্গলমহলের ক্যাম্পগুলিতে যেতে পুলিশকর্মীরা তো বটেই, পুলিশের শীর্ষকর্তারা পর্যন্ত ভয় পাচ্ছেন।

(৭) আন্দোলন দমনে এরাজ্যের সমান্তরাল পুলিশবাহিনীর ভূমিকা কী? গুন্ডা এনে বিরোধী আন্দোলনকারীদের পিটিয়ে ঠান্ডা করাই তাদের একমাত্র কাজ! সংবাদমাধ্যম জানাচ্ছে, আন্দোলন এলাকায় বসবাসকারী সিপিএমের নেতারা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। কোন কোন নেতা পুলিশ ক্যাম্পে দিন কাটাচ্ছে।

আন্দোলনকারী আদিবাসীদের মধ্যে যে সচেতনতা গড়ে উঠছে রাজনৈতিক দলগুলির আন্দোলনে তা দেখা যায় না। নেপথ্যে কারও না কারও নেতৃত্ব না থাকলে, প্রচেষ্টা না থাকলে, এই সচেতনতা গড়ে ওঠা এবং ব্যাপকভাবে তা ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব।

এই আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য মাওবাদীদের ভূমিকা দেখছে সিপিএম। সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে একাধিক মাওবাদী নেতার উপস্থিতির কথা। আন্দোলনের পাশে থাকার সংবাদ জানিয়ে প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন মাওবাদীরাও।

আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে বুঝতে অসুবিধা হয় না, নেপথ্যে থেকে এই আন্দোলনকে যাঁরা সংগঠিত করছেন নিঃসন্দেহে তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ।

এই ধারণা আরও প্রবল হয় যখন আমরা দেখি পুলিশ ও সিপিএমের সক্রিয় মদতে বেলপাহাড়িতে হঠাৎ গজিয়ে উঠল 'প্রতিরোধ কমিটি'। মাওবাদীদের তথা আদিবাসী আন্দোলনকে প্রতিরোধ করাই যাদের একমাত্র কাজ। 'প্রতিরোধ কমিটি' ছত্তিশগড়ের 'সালবা জুডুম' এর জেরক্স কপি ছাড়া আর কিছুই নয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারী আদিবাসীদের ওপর রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস চালানোর উদ্দেশ্যেই যা গড়ে উঠেছে।

আসলে সিপিএম এখন নিজের ব্যানারে সন্ত্রাস চালাতে ভয় পাচ্ছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ হার্মাদবাহিনীকে সহজে চিনে যাবে—এই ভয়। মানুষের চোখে ধুলো দিতে দু'দিন পরে 'প্রতিরোধ কমিটি' নাম নিয়ে পুনরাবির্ভাবে তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৮ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখের 'বর্তমান' এর প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদ। শালবনির মৌপালে পিটিয়ে, গুলি চালিয়ে আদিবাসীদের অবরোধ তুলল সিপিএমের হার্মাদবাহিনী।

সংবাদে আরও প্রকাশিত হয়েছে, সিপিএমের জেলা কমিটির এক সদস্য ও জেলা সম্পাদকমন্ডলীর এক সদস্য ওই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁরা সাংবাদিকদের হুমকি দিয়ে বলেন, "কোনওভাবেই আগ্নেয়াস্ত্রের ছবি নেওয়া যাবে না। ছবি প্রকাশিত হলে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে"। এরপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে একটি টাটা সুমো এলে সিপিএমের ওই নেতারা সাংবাদিকদের ঘটনাস্থল ছাড়ার জন্য ফতোয়া জারি করেন। সাংবাদিকরা ঘটনাস্থল ছাড়তেই হার্মাদবাহিনী গুলি চালানো শুরু করে।

৯ ডিসেম্বরের সংবাদ, গোয়ালতোড়ে সিপিএম সশস্ত্র হার্মাদদের মিছিল বের করে। তারা হুমকি দেয়, অবরোধ হলেই শালবনির মৌপালের মতো দাওয়াই দেবে। সিপিএমের সশস্ত্র হার্মাদ মিছিল করেছে শালবনির পিড়াকাটা, গড়বেতা ইত্যাদি বহু স্থানে।

উল্লেখ্য যে, মৌপালে সিপিএমের হার্মাদবাহিনীর হামলায় আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত আন্দোলনকারীরা শালবনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। কিন্তু পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।

আসলে সরকার প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিচ্ছে, সংবিধান আত্মরক্ষার যে অধিকার দিয়েছে তা প্রয়োগের দায়িত্ব আন্দোলনকারীদের নিজেদের। এরপর আর বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না, কেন আন্দোলনকারী আদিবাসীদের হাতে তীর, ধনুক, টাঙ্গি, নিদেনপক্ষে বঁটি থাকে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ৯ ডিসেম্বর বেলপাহাড়ির ভুলাভেদায় এক সমাবেশের মাধ্যমে 'প্রতিরোধ কমিটি' তৈরি হয়। ১১ ডিসেম্বর প্রতিরোধ কমিটির অন্যতম নেতা সুধীর মান্ডি খুন হন। ১৮ ডিসেম্বর চাকাডোবায় (পুলিশি নিরাপত্তায়) প্রথম প্রকাশ্য সমাবেশে প্রতিরোধ কমিটির নেতারা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে জানিয়ে দিলেন, তাঁরা আর মাওবাদীদের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না।

পশ্চিমবঙ্গে আদিবাসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে 'সালবা জুডুম' তৈরির অপচেষ্টা অঙ্কুরেই ব্যর্থ হল।

কল্যাণ ও লিঠুর যৌথজীবনে প্রবেশ

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ পাবনার প্রবীর সাহা। তারপর ঢাকায় এই সমিতি কাজ শুরু করে দুই ভাই—বাবলু ও কল্যাণ বিশ্বাসের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সক্রিয় সহযোগিতায়।

পুরোহিত, অগ্নিসাক্ষী বা মন্ত্রোচ্চারণ বাদ দিয়ে সুন্দরভাবে বিয়ের অনুষ্ঠান করে নজির স্থাপন করেছেন দু'ভাই।

গত ১১ ডিসেম্বর ২০০৮ কল্যাণ ও লিঠুর যৌথজীবনে প্রবেশের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠিত হল।

এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের সি ডি পাবেন বইমেলায় 'যুক্তিবাদী' টেবিলে।

ব্রাত্যজনের রোদন সঙ্গীত

নলিনী বেরা

এক

আমরা কি 'শূদ্র'? এই নিয়ে আমার নিরক্ষরা মা-কাকীমাদের কোনো মাথাব্যথাই ছিল না, কিন্তু কেন জানি বিষয়টা আমাকে যারপরনাই তাড়িত ও অনুসন্ধিৎসু করে তুলত সেই কোন ছেলেবেলা থেকেই। বিশেষত আমার বড়দা যখন তাঁর চতুর্থ শ্রেণীর ইতিহাস পাঠ মুখস্থ করার সুবিধার্থে আমাদেরই খড়গাদার নীচে সদ্যোজাত চারটি বিড়াল ছানারই নাম রেখেছিলেন 'ব্রাহ্মণ' 'ক্ষত্রিয়' 'বৈশ্য' ও 'শূদ্র'। ডাকের পৌনঃপুনিকতায় নামগুলি এমনই সড়গড় হয়ে যেত যে পরীক্ষায় "বর্ণাশ্রম" কয়প্রকার ও কী কী উত্তর লিখতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হত না। বড় হয়ে 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' ঘেঁটে দেখেছি শূদ্র শব্দটির অর্থ লেখা আছে—"নিকৃষ্টত্ব হেতু লোককারী; বর্ণচতুষ্টয়ের চতুর্থ বর্ণ; অবরবর্ণ, বৃষল, দাস।" তদুপরি জ্বল্‌জ্বল্ করছে—" পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত; মনুমতে ব্রহ্মার পাদ হইতে ইহাদের জন্ম। ব্রাহ্মনাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্যা ইহাদের বৃত্তি।" 'শূদ্র' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয়েও মারপ্যাঁচ আছে। বাদরায়নের 'বেদান্ত সূত্র' অনুযায়ী 'শুক্' শব্দের অর্থ 'শোক' আর 'দ্রু' ধাতু থেকে জাত 'দ্র' শব্দের মানে 'ধাবন করা'। তার মানে একত্রে অর্থ হল 'শোকের দিকে যাত্রা করা'। পানিনির 'উণাদিসূত্রে'ও আছে 'শুচ্' বা 'শুক্' ধাতু + 'র'। এই 'র'-এর সঠিক কোনো ব্যাখ্যা নেই। আমি 'র'-এর অর্থ ধরব 'রোদন' করা। তাহলে অর্থ দাঁড়াল 'শোকের জন্য রোদন' করা। হালফিলের হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'ও মানে করছে "শূদ্র পুং ✓ শুচ্ (শোক) + র (রক্)-ক, নিকৃষ্টত্ব হেতু শোককারী"। আমার এই অর্থটাই সবচেয়ে মনঃপুত। আমি আজ 'শূদ্র' উষা 'ক্ষুদ্রজনের'-ই লোকসংস্কৃতিতে আমারই মা-কাকীমা-বোনেদের 'রোদন বৃত্তান্ত' শোনাব। তার আগে জানতে চেষ্টা করব কী করে তথাকথিত 'শূদ্র' বা 'ক্ষুদ্র' থেকে আজও আমরা 'অনগ্রসর'।

অনেক তত্ত্বতালাশ নিয়ে অতঃপর সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে, 'অনার্য' ও 'আর্য' দু'জনেই ভারতবর্ষে 'বহিরাগত'। কে আগে এসেছেন কে পরে, সিন্ধু সভ্যতার আগে আর কোনো সভ্যতা ছিল কী ছিল না, 'আর্য' একটি ভাষার নাম না জাতির নাম,

'আর্য' 'অনার্য' এই দুই বহিরাগতের পূর্বেও ভারতবর্ষে আর কোনো জাতি ছিল কি ছিল না—এই নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে, থাকবে, তবে প্রাচীন ভারতে 'শূদ্র' নামধেয় একটা 'শ্রেণি' যে গড়ে উঠেছিল সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কথিত আছে, প্রথম প্রথম শূদ্ররা 'আর্য সমাজের চতুঃসীমার বাইরে ছিলেন। এখন দেখা যাক 'আর্য' কারা? শব্দটির অর্থ কী? 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এ নির্দিষ্ট করে বলা হচ্ছে "আর্যাবর্তনামী বেদোক্ত প্রাচীন জাতিবিশেষ। ইঁহারা মধ্য এশিয়া, মতান্তরে, কাশ্‌পিয়ান-হ্রদের নিকটবর্তী প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। ইঁহারাই ভারতবর্ষে 'আর্য' নাম ধারণ করেন এবং ভারতের আদিম নিবাসীরা 'দাস' 'দস্যু' বা 'শূদ্র' নামে পরিচিত হন। 'আর্য' শব্দটির অর্থ করা হছে চোদ্দোরকম—'বিদ্বান্' 'অনুষ্ঠাতা' 'মান্য' 'পূজ্য' 'সাধু' 'শ্রেষ্ঠ' 'কর্তব্যচারী' 'প্রাপ্তব্য' 'শান্তচিত্ত' 'উদারচরিত' 'সঙ্গত' 'কুলশীলাদিসম্পন্ন' 'তত্ত্বদর্শী' 'বুদ্ধ'। ইরানের অর্থাৎ প্রাচীন পারস্যের অধিবাসীরাও নিজেদের 'আর্য' বলতেন। তাই ইরানীয় ভাষায় মানে করা হচ্ছে, 'অধিকৃত বা অভিজাত'। আলোচনার খাতিরে আমি এই শব্দ নিশ্চয়ই গ্রহণ করব যা 'অধিকার' শব্দস্পর্শী। আর্যরা নাকি দু-দফায় এসেছিলেন ভারতবর্ষে। প্রথমবার এসেছিলেন স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এখনকার পাঞ্জাবে। তাঁরা প্রাক্-আর্য বা অনার্যদের বিতাড়িত করে বসতি স্থাপন করেছিলেন সেখানে। দ্বিতীয়বার এসেছিলেন গিলগিট ও চিত্রলের ভিতর দিয়ে স্ত্রী-পুত্র পরিবার ছাড়াই মধ্যভারতে। তাঁরা বলপূর্বক প্রাক্-আর্য নারীদের অধিকার করে তাঁদেরই গর্ভে নাকি জন্ম দিয়েছিলেন 'শূদ্রদের'। অথচ 'ঋক্‌বেদের' একমাত্র 'পুরুষসুক্ত' ছাড়া আর কোথাও 'শূদ্রদের' উল্লেখ নেই, তাও বলা হচ্ছে 'পুরুষসুক্ত' পরবর্তী সময়ে 'ঋক্‌বেদে' প্রক্ষিপ্ত করা হয়েছে! তা ছাড়া প্রাক্-আর্য দ্রাবিড় পুলিন্দ শবরগোষ্ঠীর মধ্যেও 'শূদ্রদের' উল্লেখ নেই।

তাহলে? তবু একথা ধ্রুব সত্য যে, প্রাক্-আর্য বা অনার্যদের আর্যরা পরাজিত ও অবদমিত করে তাঁদেরই নামিয়ে এনেছিলেন 'শূদ্রের' পর্যায়ে। কী ছিল 'পুরুষসুক্তে'? 'পুরুষসুক্ত' অর্থাৎ ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে আছে, আদি পিতা ব্রহ্মার মুখ থেকে 'ব্রাহ্মণ', বাহু থেকে 'রাজন্য', উরু থেকে 'বৈশ্য' আর পা থেকে 'শূদ্রের' জন্ম। যেহেতু একই উৎস থেকে জাত তাই প্রথম প্রথম শূদ্রদের আর্য সমাজের বাইরে রাখা হলেও নাকি পরবর্তী বৈদিক সভ্যতায় চতুর্থ বর্ণ হিসাবে তাঁদের সংযুক্তি ঘটেছিল। বিতর্ক থাক, আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব 'আর্য' ও 'শূদ্র' ওই দুটি শব্দনিচয়ের ভিতর নিহিতার্থ বাক্যবন্ধে, একদল 'অধিকার' করতে করতে 'অভিজাত' হবেন আরেকদল ক্রমশ 'শোকের' দিকে ধাবিত হবেন।' তাঁদের হাত 'অথর্ব বেদের' যুগেও শিল-নোড়ায় বাটনা বাটতে বাটতে সারাক্ষণ ভিজে সপ্‌সপে থাকবে, গোবরের নাদি কুড়িয়ে ঘুঁটে দিতে হবে, কোনো উচ্চবর্ণ ধনী গৃহস্বামীর স্ত্রী অতিরিক্ত ঘি খেয়ে

বমি করে ফেললে, সেই ঘি জমিয়ে রেখে তাঁদেরই খেতে হবে, গায়ে মাখতে হবে, যেহেতু তাঁরা কোনোরকম দেবতা ছাড়াই প্রজাপতি ব্রহ্মার পা থেকে জন্মেছেন তাই তাঁদের 'গৃহস্বামীই' দেবতা, তাঁর পা-ধোয়া জল খেয়েই তাঁদের বেঁচে-বর্তে থাকতে হবে—"শূদ্রস্য দ্বিজাতি শুশ্রূষাবার্তা"। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন দ্বিজ-জাতির সেবা করাই 'শূদ্রের' বিধি। এক্ষণে কারা শূদ্র? সেই 'থোড়বড়ি খাড়া খাড়াবড়ি থোড়ের' সূত্র ধরেই বলতে হয়, নবাগত আর্যদের দ্বারা প্রাক্-আর্যরা পরাজিত হলেন, পরাজিত হয়ে কেউ কেউ বশ্যতা স্বীকার করে 'দাস' হলেন, কেউ কেউ পালিয়ে গেলেন অরণ্যে, দূরের গিরিগুহায়। তাঁরাই সময় সময় আর্যদের প্রতি আক্রমণ করতেন, আর্যেতর সেই শত্রুদেরই আর্যরা আখ্যা দিলেন 'দস্যু'। হয়তো সেদিনের সেই 'দস্যু' আজকের 'আদিবাসী' আর 'দাস'-ই 'শূদ্র'। বলাই বাহুল্য, 'আদিবাসী' আর 'শূদ্র' দু'জনেরই আদি উৎস কিন্তু সেই প্রাক্-আর্যরাই। কার্যত সংখ্যায় তাঁরা আর্যদেরও অধিক। তার উপর শূদ্রদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন নানারকম বৃত্তিজীবীরা। যেমন কর্মার (কামার), চর্মন্ন (চর্মকার), তক্ষণ (সূত্রধর), বপ্তু (নাপিত), সিরী (তন্তুবায়), ধুর্যদ (শকট চালক), ধমাতৃ (ধাতু গালাইয়ের কারিগর), অরিত্রী (নৌচালক), ইত্যাদি। তা ছাড়া 'মনু' অনুমোদিত "স্ত্রীরত্নণং দুষ্কুলাদপি" অনুলোম-প্রতিলোম বিবাহপদ্ধতিতে 'বর্ণসংকর' জাত শূদ্রের সংখ্যশ ক্রমশ:ই বেড়ে যাচ্ছিল। প্রাচীন ভারত এমনকী আধুনিক ভারত 'অনার্য' ও 'শূদ্রদের' দেশ। "ভারতের কৃষ্টির মূলে আছে গণশ্রেণীসমূহ, বেদের "শূদ্রারাইয়াউ" (শূদ্র ও বৈশ্য), অর্থাৎ কায়িক শ্রমজীবী ও কৃষকের দল।" এ তো গেল ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথা। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিতে, "স্বধর্মরত শূদ্রের সংখ্যাই বেশি। তাই একদিক থেকে দেখতে গেলে শূদ্র ধর্মেরই দেশ।.... অতি প্রকাণ্ড শূদ্রধর্মের জড়ত্বের ভারাকর্ষণে ভারতের সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মাথা হেঁট হয়ে আছে।"

দুই

'আর্য' ভাষাপদবাচ্য না জাতিপদবাচ্য, আমি সে-বিতর্কে যাচ্ছি না, তবে ভারতবর্ষে আর্য আগমনের বহু পূর্ব থেকেই আরও প্রাচীনতম জাতিগোষ্ঠীর মানুষজন যে ছিলেন বা এসেছিলেন এ-বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। 'নেগ্রিটো' 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' 'মঙ্গোলয়েড' 'মেডিটেরেনিয়ান' 'আলপাইন', সবশেষে এসেছিলেন 'নর্ডিক' বা 'আর্যরা'। নাকি সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিলেন 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েডরা'। এঁদের ভাষা ছিল 'অস্ট্রিক', যা কি না 'কোল' বা 'মুন্ডা'দেরই ভাষার স্ব-গোত্র। কাদের মাথা লম্বা, নাক লম্বা, গায়ের রং ফর্সা, চোখ কালো, কাদের মাথা গোল, চওড়া নাক, গায়ের রং হলুদ, কাদের বা খর্বাকৃতি দেহ, মাথা লম্বা, নাক খাঁদা, আর তাই দেখে আজ কে 'নর্ডিক' কে 'প্রোটো-অস্ট্রালয়েড' কে 'মঙ্গোলয়েড' কে 'দ্রাবিড়িয়ান'

চিনে-ওঠাই দায়! আমি সে-চেষ্টাও করছি না, তবে খুঁজে পেতে চেষ্টা করব 'আর্য' বা 'প্রাক্-আর্য সময়কালে কারা ছিলেন এ বাংলায়, আর্য আগমন বা 'আর্যীকরণ'-ই বা কবে ঘটল, কী করে ঘটল, আর 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' দেশটাই বা কোথায় ছিল!

পাঞ্জাব বা 'আর্যাবর্ত' তৈরি হওয়ার অনেক আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল বিন্ধ্যাচল ও ছোটনাগপুরের 'পুরাভূমি'। এই পুরাভূমিরই অন্তর্গত "সূহ্মা: রাঢ়া:" বা রাঢ়া-বঙ্গ। 'রাঢ়' বলতে বুঝাত অধুনা মেদিনীপুর, সিংহভূম, মালভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, ২৪-পরগনা, খুলনা, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ ও চন্দ্রদ্বীপ পুঞ্জকে। 'ঐতরেয় আরণ্য'কে 'বঙ্গ' শব্দের উল্লেখ পাচ্ছি, যদিও 'বঙ্গের' অর্থ এখানে 'পাখি'। প্রাচীন বাংলা অনেক খণ্ডে বিভক্ত ছিল, একেক খণ্ডের অধিবাসী ছিলেন একেক গোষ্ঠীর 'জন' বা 'ট্রাইব'। সেই থেকে একেকটি 'জনপদ', যেমন 'বঙ্গ'। এই নিয়ে মহাভারতের একটি কাহিনিও আছে—অসুররাজ বলির অনুমতিক্রমে ঋষি দীর্ঘ তমসের ঔরসে রানি সুদেষ্ণার গর্ভে 'অঙ্গ' 'বঙ্গ' 'কলিঙ্গ' 'সুহ্মা' ও 'পুন্ড্র' নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এঁদের প্রত্যেকেরই নামানুসারে গড়ে ওঠে একেকটি 'জনপদ'। বলাই বাহুল্য, 'অনুলোম' পদ্ধতিতে আর্যঋষি দীর্ঘতমসের ঔরসে শূদ্রা রানির গর্ভে শূদ্র-পুত্র-উৎপাদনের হেতু 'অঙ্গ' 'বঙ্গ' 'কলিঙ্গ' 'সুহ্মা' ও 'পুন্ড্র'ও হয়ে গেল 'শূদ্রদেশ'। চীন-তিব্বতীয় ভাষায় 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ 'জলাভূমি'। আবার 'কোল' বা 'হো'-রা কোল ভাষায় তাঁদের নিজের দেশের নাম রেখেছিলেন "বাংলো"। 'বাং' মানে 'না', 'লো' মানে সেচ দিয়ে জল তোলা। তার মানে যে দেশে জলসেচের দরকার হয় না, তাই 'বাংলো', 'বাংলো দিশম্' বা বাংলাদেশ। পুরাণে সর্বপ্রথম 'অনার্য' শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে এই বাক্যে, "কীকটা নাম দেশ অনার্য নিবাসঃ"। 'ঐতরেয় আরণ্যকে'ই আছে, "প্রজাতি তিস্র: অত্যায়র্ময়রিতি যা বৈ তা ইমা: প্রজা: তিস্র:। অত্যায়নায়ং স্তানীমানী বয়াংসি বঙ্গবগধাশ্চেরপাদা:।।" বঙ্গ, বগধ (মগধ) আর চেরপাদ দেশকে বলা হচ্ছে পক্ষীর দেশ, সেখানকার লোকেরা পাখির মতো কিচির-মিচির দুর্বোধ্য ভাষায় নাকি কথা বলেন! আসলে চেরপাদ বা পালামৌয়ের চেরোজাতি, মগধ ও বঙ্গের সাঁওতাল-হো-মুন্ডারা 'খেরওয়াড়'। তাঁরা 'খের' বা পাখির বংশধর। তাই ঐতরেয় মহিদাস মহামুনি তাঁদের 'বয়াংসি' বলেছেন। তা ছাড়া ঐতরেয় মহামুনির মা তো ছিলেন শূদ্রা! বৈদিক আর্যরা 'কীকটা' দেশবাসীকে ঘৃণা করতেন, তাঁদের 'দস্যু' ভাবতেন, অঙ্গের অধিবাসীদের 'সংকীর্ণযোনি' মনে করতেন। তীর্থযাত্রা ছাড়া কেউ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে আসতেনও না। কেউ এসে ফিরে গেলে তাঁকে 'পুনস্তোম' 'বৈশ্বানরং হবি:" নামক প্রায়শ্চিত্ত-যজ্ঞ করতে হত। তাহলে? এ-বঙ্গে 'আর্যীকরণ' ঘটল কী করে? কবে ঘটল? আদৌ ঘটেছিল কী?

পরে আর্যীকরণ ঘটুক আর নাই ঘটুক, তৎকালীন রাঢ়-সূহ্মা-অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ যে 'বেদবিরুদ্ধ' 'অযহ্মান' ছিল, আর্যদের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্পর্কই ছিল না, তাঁদের

আলাদা ভাষা উন্নততর সংস্কৃতি ছিল, এ-বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের কোনো দ্বিমত নেই। সম্ভবত এই ভাষা অস্ট্রিক-ভাষাভাষীরই অন্তর্গত 'অসুর ভাষা'। 'আর্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প' বৌদ্ধগ্রন্থেই উদ্ধৃত আছে, "অসুরানাং ভবেদ্ বাচা গৌড় পৌন্ড্রোদ্ভবা সদা। যথা গৌড়জন শ্রেষ্ঠং রুতং শব্দবিভূষিতম্।।" ধীরে ধীরে ধর্মপ্রচার ও তীর্থভ্রমণের মধ্য দিয়েই এতদ্ প্রদেশে আর্য সংস্কৃতি ঢুকে পড়ে। ঢুকে পড়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ ও বর্ণভেদ। তার আগে বঙ্গে-রাঢ়ে, ধর্ম প্রচারে এসেছিলেন বেদ-ব্রাহ্মণ-বর্ণাশ্রম বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারকেরা। তাঁদের দ্বারা রাঢ়-সূহ্মা-বঙ্গের আদি কৌম সংস্কৃতির তেমন কিছু হেরফের ঘটেনি। বঙ্গে-রাঢ়ে অনার্যীয় মাতৃপূজা ও শক্তি আরাধনা এখন পর্যন্ত তুমুল গতিতে বিদ্যমান। পুরাণ-মহাভারতের কথা থাক্, গৌড়বঙ্গ যখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীন তখন আর্যাবর্তের বেদজ্ঞ-যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসে বঙ্গে ভূমিদানের ঘটনা বিরল নয়। গৌড়বঙ্গের দু'জন নরপতি, শশাঙ্ক ও ধর্মপাল, সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করেন। হিউ-য়েন-সাঙের বিবরণ অনুযায়ী শশাঙ্ক ছিলেন শিবভক্ত ও বৌদ্ধ বিদ্বেষী, তিনিও সরযূর তীর থেকে নাকি বারোজন ব্রাহ্মণ এনেছিলেন বঙ্গে। পাল বংশের রাজাদের আমলেও শ্রাবস্তী-কোলঞ্চ-মধ্যদেশ থেকে ব্রাহ্মণ-আনয়ন অব্যাহত ছিল। তবু পালযুগে 'সপ্তশতী' বা সাড়ে সাতশত ব্রাহ্মণ পরিবার থাকা সত্ত্বেও গৌড়বঙ্গে সাম্যবাদী অ-ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেনযুগের 'নয়াব্রাহ্মণ্যবাদ' সে-ব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে তথাকথিত এক ভয়ংকর 'কুলীন' সমাজ ব্যবস্থার পত্তন করলেন, যে-সময় থেকে বঙ্গবাসী ফের প্রকৃত প্রস্তাবে "শোকের দিকে ধাবিত" হলেন। সেন বংশের কোন এক আদি শূর নাকি কান্যকুব্জ থেকে পাঁচঘর ব্রাহ্মণ ও পাঁচঘর কায়স্থ নিয়ে আসেন। বল্লাল সেনের আমলে তাঁরা ভয়ংকর ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। দীনেশচন্দ্র সেনের কথায়, "বঙ্গদেশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নব্য ব্রাহ্মণ্যের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগণ সমাজে যে সকল পরিবর্তন আনয়ন করিলেন, তন্মধ্যে প্রধান এই কয়েকটি (১) সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ হইল। (২) গৌরীদানের ব্যবস্থা হইল। কথিত ভাষাগুলি ঘৃণ্য বলিয়া কোনও ভদ্র রচনার গণ্ডিতে স্থান পাইল না। (৩) দেবভাষা সংস্কৃতের প্রভাব অশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল। (৪) ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানে দাঁড়াইয়া ঘোষণা করিলেন তাঁহারই সমাজের একমাত্র আরাধ্য—অপরাপর জাতি পতিত শূদ্র।" এতদিনে বঙ্গ প্রকৃত বঙ্গবাসীদের কাছ থেকে হাতছাড়া হল। 'বৃহদ্ধর্ম' ও 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' দেখতে পাই, ব্রাহ্মণ ছাড়া বঙ্গের বাকি অধিবাসী—বর্ণাশ্রমের চতুর্থ স্থানাধিকারী শূদ্র তো বটেই, এতদ্ভিন্ন বেদ-ব্রাহ্মণবিরোধী সংস্কৃতির সন্তান-সন্ততিরাও—'শূদ্র' বলেই গণ্য হলেন। প্রবোধচন্দ্র সেন, এম-এ-র 'বাংলার ইতিহাসের কয়েকটি গোড়ার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধের দু-চার লাইন তুলে দিচ্ছি, "অস্ট্রিক ভাষী অনার্য জাতিরাই পরবর্তীকালে আর্যদের সম্পর্কে এসে ক্রমে আর্য-ধর্ম, আর্য-ভাষা, আর্য সমাজবিধি,

এক কথায় আর্য সভ্যতাকে আত্মসাৎ করে আর্য সমাজভুক্ত হয়ে গেল। বাংলার এই আদিম অস্ট্রিক ভাষী অনার্যরা কীরূপে শুধু আর্য সমাজভুক্ত নয়, পরন্তু আর্যদের সমাজবিধি, ধর্ম, ভাষা ও সভ্যতার পতাকাবাহী গর্বিত জাতিতে পরিণত হয়েছে তার ইতিহাস খুবই উৎসুক্যকর।" এখানেই আমার ঘোরতর আপত্তি, উপরন্তু সে উৎসুক্যকর মনগড়া ইতিহাস জানার আগ্রহও আমার নেই, আমাদের প্রায় প্রত্যেকেরই জানা সেই আদিম অস্ট্রিক ভাষী অনার্যদের 'লিঙ্গ' পূজাকেই তথাকথিত 'আর্যাকরণ' করে দেবাদিদেব শিব-আরাধনায় রূপান্তরিত করেছি, কালী-মনসাকে আমাদেরও দেবী বানিয়েছি, 'কারামবিন্তি'-কে 'আমার করম ভাইয়ের ধরম' করেছি, 'সহরায়'-কে বাঁদনা, 'রহিন'কে আমাদেরও 'রহিন' বা হলকর্ষণ উৎসব বানিয়েছি, অথচ তাঁরা এখনও 'সারজম্ গিরা' 'বাহা' বা 'সারহুল' করেন, তাঁদের কেউ কেউ এখনও ব্রাহ্মণের ছায়া মাড়ান না, নিজেদের 'কৌম-কালচার' নিয়েই মশগুল আছেন, এ তো সত্য। বরং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তকেই গুরুত্ব দেব বেশি, বাঙালি 'নিম্নবর্ণ বা সংকর জাতি' যাই হোন না কেন, তাঁরা যে এই বঙ্গের 'আদিমতম মানব গোষ্ঠীজাত' ও 'আদিবাসী' বা 'দেশজ মানবগোষ্ঠী' তা অস্বীকার করা যাবে না।

বিভেদকামী ব্রিটিশ সরকার এসে তাঁদের অষ্টোত্তর শতনামে ডেকে ফের বর্ণবিদ্বেষ শুরু করলেন। ১৮৮১-তে 'অ্যাবওরিজিন্স্', ১৮৯১-এ 'ফরেস্ট ট্রাইব্স', তারপর ১৯৩১-এ 'প্রিমিটিভ্ ট্রাইব্স'। ট্রাইব্স, ট্রাইব্স! 'ব্যাকওয়ার্ড ট্রাইব্স' 'জিপ্সি ট্রাইব্স' 'হিলি ট্রাইব্স' 'ক্রিমিন্যাল ট্রাইব্স' 'ওয়াইল্ড ট্রাইব্স' 'ইন্ডিজেনাস্ ট্রাইব্স' 'হিন্দু প্রিমিটিভ্ ট্রাইব্স'। ব্রিটিশরা চলে গেলেন, ভারত স্বাধীন হল, তবু কলঙ্ক মোচন হল না। আমরা আরও কত নতুন নতুন 'কয়নেজ্' আবিষ্কার করে চলেছি, 'আদিবাসী', 'তপশীলভুক্ত জাতি' বা 'সিডিউল্ড কাস্টস' 'তপশীলভুক্ত উপজাতি' বা 'ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস'। যাক সেকথা, যে জিজ্ঞাসা দিয়ে আলোচনার 'আঙটপাত' করেছিলাম, "আমরা কি শূদ্র", তার উত্তর খোঁজার প্রয়াস এতক্ষণ করা গেল! হ্যাঁ, আমরা শূদ্রই। শূদ্রলোকের সংস্কৃতিই 'লোকসংস্কৃতি'। লোকসংস্কৃতিতে কোথায় যেন একটা অবজ্ঞার ভাব থেকেই যায়! কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এহেন সংস্কৃতি অবজ্ঞারও ঊর্ধ্বে, যেন 'জ্যান্ত জীবাশ্ম' যুগ যুগ ধরে আমাদেরই মা-কাকীমা ও বোনেদেরই হাসি-কান্নায় চোখের 'লোরে' জমাট বেঁধে আছে!

তিন

লোকসংস্কৃতির অঙ্গণে কীভাবে জড়িয়ে আছেন আমারই মা-কাকীমা-বোনেরা, এক্ষণে তাই সবিস্তারে বলব। আমরা বাঙালিরা, কী শূদ্র কী আদিবাসীরা, মোটামুটিভাবে 'মাতৃতান্ত্রিকজন'। 'মোটামুটি' বললাম এই কারণে যে কোথাও আর 'খাঁটি

মাতৃতান্ত্রিকতা' নেই, তবু আমাদের সংসারে মা-বোনেদের গুরুত্বই বেশি, 'মা বলিতে প্রাণ/ করে আনচান/ চোখে আসে জল ভরে"—এ তো প্রমাণিত সত্য! মাতৃতান্ত্রিকতায় মায়ের পরিবার অর্থাৎ মায়ের ভাই-বোনেরাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন, মামার কদর যেন অনেকটাই বেড়ে যায়, আমরা কোন ছেলেবেলা থেকেই তো শুনে আসি, "তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই, মামার বাড়ি ভারি মজা কিল-চড় নাই।" সুবর্ণরেখা নদীতীরে মায়ের শ্রাদ্ধের ঘাটক্রিয়াদি আটকে যাচ্ছে সুদূর ঝাড়গ্রামের ফেঁকো থেকে 'মামাবাবু' এসে পৌঁছায়নি বলে! তারপর যেই নাদুস-নুদুস নিতাই মামাকে নদীবালিতে হেঁটে আসতে দেখা গেল অমনি কীর্তনীয়াদের পাঁচজোড়া খোলে একসঙ্গে চাঁটি পড়ল! আমরাও স্বস্তি পেলাম। বিয়ের আগে, বিয়ের পরেও ভাই-বোনের সঙ্গে যেন একটা ব্যাখ্যার অতীত সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। পৌষ পরবে বা মকর পরবে ভাই তার বোনকে নিয়ে যেতে পারেনি, তাই বোন 'রুদালি' করছে, "বেহা যে দিলি ভাই রে বড় লদীর উধারে, এত বড় পৌষ পরবে রাখলি রে পরের ঘরে/ মন আমার কেমন করে, উড়ে যাঞে বসব রে মাঝু ঘরে।।" 'তর' আর সইছে না যেন উড়ে গিয়ে এক্ষুনি মাঝের ঘরে বসে পড়বে, মন আর মানছে না। "গুণবতী তাই আমার মন কেমন করে/ হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি/ আয়রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।।" আমি কিছুই বলছি না, রবীন্দ্রনাথ এ কান্নার কী মানে করেছেন দেখি, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনি, সমস্ত দুর্বিষহ বেদনা পরম্পরা কে বলিয়া দিবে? দিনে দিনে রাত্রে রাত্রে মুহূর্তে কত সহ্য করিতে হইয়াছিল—এমন সময়, সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরের হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃস্নেহের চির পরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে। সেই ঘর, সেই খেলা, সেই বাপ-মা, সেই সুখশৈশব, সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি একদণ্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়!" মাতৃতান্ত্রিকতার এতবড় স্বরূপ আর কী হতে পারে?

সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী আমাদের গ্রামের কেউ, সে নারীই হোন বা পুরুষই হোন, পরলোক গমন করলে তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে পিণ্ডদান গো-দান ইত্যাদি নানাবিধ পারলৌকিক ক্রিয়াকালে নিশ্চয় ডাক পড়ত প্রমথর মা ভারতের জ্যেঠীমা নকুলের পিসিমা শৈলর দিদি প্রমুখ বিখ্যাত 'রুদালিয়া'-দের। তাঁরা এসে যথাসময়ে, হয়তো সে সময় শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত বা পরলোকগতার গোরুর ল্যাজুড় মুচড়ে ধরে বৈতরণী পারাপারের নিমিত্ত 'গোদান' পর্ব শুরু হতে চলেছে, "এ সময় কাঁদতে হয়" বলে উচ্চৈ:স্বরে 'রোদন' শুরু করে দেন। রোদনের সংলাপ ক্রমে উচ্চকিত হয়। বলাই বাহুল্য, রোদন যতই উচ্চতর হবে মৃতের স্বর্গারোহণ পর্বও নাকি ততই ত্বরান্বিত হবে। জন্ম মৃত্যু বিবাহে শূদ্রজীবনে রোদনের ভাষা যেন লিখিত-পড়িত

হয়েই আছে। ওপার বাংলায় 'সায়ার গান' বলে একটা কান্নার গান আছে, যা কী না গাঁয়ে-ঘরের বয়স্কা মহিলারা সমবেত হয়ে উচ্চৈ-স্বরে সারারাত ধরে গেয়ে থাকেন কারুর ঘরের অসুস্থ রোগীর আরোগ্য কামনায়, যত জোরে গাইবেন নাকি আরোগ্যও আসবে তত দ্রুতই। যেমন দু-একটা কলি, "বড় কষ্টের কথা রে আমার পড়েছে মনে/ কষ্টে কষ্টে হা রে জনম গেল রে/ হা রে দয়াল কষ্টেরই কপাল/ হা রে বড় কষ্টের কথা রে আমার পড়েছে মনে।" মনে করিয়ে দেয় বইকী অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 'চর্যাগীতি ও দোহাকোষে'র গানগুলিকে।

ছোট ছোট পঙ্‌ক্তি, দু-চার লাইনের। মর্মার্থ যাই হোক প্রকৃত প্রস্তাবে বিধৃত হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শূদ্রদেরই অন্তেবাসী জীবনের রোদনধ্বনি। "টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী। হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী। "বা" নগর বাহিরি রে ডোম্বী তোহারী কুড়িয়া" "তান্তি বিকনঅ ডোম্বী অবয় না চাঙ্গেড়া"। যাক সে কথা, যেজন্য মাতৃতান্ত্রিকতার ধুয়ো তুলেছিলাম এক্ষণে সেই প্রসঙ্গে আসি। 'লোকসংস্কৃতি'তে নারী অর্থাৎ আমাদেরই মা-কাকীমা-বোনেদেরই ভূমিকা। আমরা কে না জানি—'টুসু' 'ভাদু' 'করম' 'জাওয়া' 'বাঁদনা' 'সহরায়' 'সয়লা' 'সায়া' 'ঘেঁটু' 'ইতু' 'বাহা' 'সারহুল' 'ভাঁজো' 'ছট্' 'হুকুমদেওয়ের পূজা' 'হস্তিকন্যার গান' 'মকর' 'সাঁকরাত' ইত্যাদি 'লোক উৎসবে' আমাদেরই মা-কাকীমা বোনেদেরই অংশভাগ অধিক! 'লোক' কারা, 'লোকসংস্কৃতি' বা 'ফোকলোর' কি—এই নিয়ে 'জোনাস বালি' 'বটকিন' 'এসপিনোজার' 'এম ফস্টার' 'হারস্‌কোভিট্‌স্' 'ফ্রান্সিস পোর্টার' 'থমসন' 'স্মিথ' 'আর্চার টাইলর' 'আশুতোষ ভট্টাচার্য' 'আহমদ শরিফ' প্রমুখ তাবড় তাবড় পণ্ডিতেরা অনেক চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন, আমি সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, সে ক্ষমতাও আমার নেই, তবে কেউ বলেও দেয়নি, ছোটবেলা থেকে যেমনটা আমার মা-কাকীমা ও বোনেদের এতদুপলক্ষে স্বচক্ষে দেখে আসছি তার কথাই বলতে পারি, সে কথাই প্রাণের আকুতি মিশিয়ে বলব।

চার

অভাবের ভাদ্রমাস এসে গেল। অভাবের এইজন্য যে, ধানখেতের ধানগাছগুলোর 'গর্ভাধানে' তখনও ধানশিষ আসেনি, সবুজ 'বোয়ালি' হাওয়ার দাপটে লহ-লহ করছে। শুধু যা 'ডাহি' জমিনে 'মকাই' পেকে 'গাদর' হয়ে গেল। অভাবের এই দিনগুলোয় নুন দিয়ে মকাই বা ভুট্টা সেদ্ধ, যাকে বলে 'লেটো', আর তেঁতুলের বীচি দিয়ে মহুল-সেদ্ধ—ওই আমাদের খাদ্য। এর মধ্যেই আমার নিজের ও জেঠতুতো-খুড়তুতো বোনেদের, ওই হাজ্‌রি-গুজ্‌রি-কঁই-পুনোই-খুকেন-ভুট্‌কীদের মধে শোরগোল পড়ে গেল। আর ক'দিন বাদেই 'একাদশী', 'করমের' 'জাওয়া' পাততে হবে যে! 'জাওয়া' পাততে হবে 'করম একাদশীর' তিনদিন, পাঁচদিন, সাতদিন বা ন'দিন আগে। বোনেরা সুবর্ণরেখার বালি ছেঁকে নিয়ে এলো বাঁশের নতুন ডালায়।

তাতে হলুদ মাখিয়ে কুর্‌থি কলাই মুগকলাই বিরিকলাই সরিষা ছোলা মটর মকাইয়ের বীজ পুঁতে দিল। প্রতিদিন 'জাওয়া ডালিতে' জল ছিটোল আর সিনানের সময় ঝিঙাপাতায় তেল-হলুদ-দাঁতনকাঠি রেখে 'জাওয়া' গীত গাইল, "সুবর্ণরেখার বালি মিঞে জাওয়া পাতিব গো"। নাচল, পাঁতা নাচ, গোল করে দু-পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়ে, "ওদের মাসের গাদর জনার লাল টুপায় যাব গো। আর কি মাঞ ওর কোলে বিটি জনম পাব গো।" পরনের কাপড়টার আঁচল মুখে চাপা দিয়ে মা বসে আছেন মাটির দাওয়ায়। যেন কাঁদছেন, "ঝিঙা তুললাম ডালি তালি আর-অ কত জালি লো। শিশু ছাইলার বেহা দিঞে অন্তর হৈল খালি লো।" সত্যি সত্যিই তো এ-জন্মে এ-গর্ভে আর তো কন্যাসন্তান হবে না। তার উপর এই মেয়ের বিয়ে দিলেই তো অন্তর শূন্য হয়ে যাবে! এসময় সন্ধ্যা হতে না হতেই ঝিঙাফুল রদ্‌বদিয়ে ফুটে ওঠে, ঝিঙা-জালিতে ঝিঙা-লতা ভরে ওঠে, চারধারে বনে বনে 'সুরগুঁজা' ফুল! বোনেরা সুর তোলে, "এক মুঠা সুরগুঁজা ফুল ফুটে লালে লাল গো। বিটি ছানার 'ধুরে' বেহা কাঁদিছে অন্তর গো।" কান্না, কান্না। এরপরেও মেয়ের যদি বিয়ে হয় অনেকদূরের কোনো এক গ্রামে? চোখের 'লোর' যে আর বাঁধ মানে না! মাঠঘাট থেকে ছাগল চরিয়ে গোরু চরিয়ে এসে সাঁঝবেলায় যখন ঝিঙাফুল কাঁকুড়ফুল স্ফূটনোন্মুখ, কাক-শালিকের ঠোঁটের মতো আধ-ফোটা, তখন তরু-বিঝল-হাগ্‌রি-গুজ্‌রি-খুকেনরা আমাদেরই ঘরে রাখা 'জাওয়া ডালা'র সামনে ঝুপ ঝুপ বসে পড়ে। তারা তো আজ যে-সে নয়, হাজার হোক কুমারী হলেও আজ তারা 'জাওয়া'র মা। এখন তাদের কত কী নিয়মকানুন মানতে হয়। টক খাবে না, ঝাল খাবে না, শাকপাতা খাওয়াও মানা। শুধু কি খাওয়া, গামছায় ভিজাচুল ঝাড়তেও মানা। 'জাওয়া' তো শরতের শস্যোৎসব, অঙ্কুরোদ্‌গম সন্তান কামনারও প্রতীক। এতদিনে সত্যিসত্যিই তো কুর্‌থি-মুগ-বিরি-সর্ষে-ছোলা-মটর-মকাইয়ের বীজ থেকেও চারা গজিয়েছে! মেয়েরা খুন্ খুন্ করে সুর ভাঁজে, "বাড়ির ধারে জৈড়গামছায় কাউয়া ডাকিছে গো, ভাই হামার লিঞে যাইতে আইল। শাউড়ি-ননদের ঘর নাই, পাঠাঁই দিল গো, ভাই হামার কাঁদিয়ে ফিরিল।" রোদন দীর্ঘায়ত হয়—"বেহা যে দিলি ভাই রে বড় লদীর পারে রে আনা-লেগা কে করিবে আর। বাপ যদি মরে মায়ের দিশা হারায় রে আনা-লেগা কে করিবে আর।। ভাই যদি আনতে গেল হামার ভাজ থুত্‌না ফুলায় রে। ফুলাও ফুলাও ফুলাও ভাজ নাই যাব তর-অ ঘরে রে।।" ভাই-ভাজের প্রতি অভিমান বড় কম নয়, "মায়ে বাপে বেহা দিল খাপ্‌রা ঘর দেখেঁ জনম গেল ঢালামাড় খাতে"। তবু মা-বাপ-ভাইকে ছল করে সুখের বার্তা পাঠাচ্ছে, হাগ্‌রি-গুজ্‌রি-কঁই-বিঝলরা গান ধরেছে, "একঅ দিনকার হলৈদবাঁটা তিনঅ দিনকার বাসি লো। মা বাপকে বলেঁ দিবে বড়ই সুখে আছি লো।। মাঞে শুনল বাপে শুনল শুনল সাধের ভাই লো। মা বড় সুজাতের বিটি কাঁদিতে লাগল লো।।" আর থাকতে পারি? মায়ের 'ছামু' দিয়ে গুটিগুটি 'জাওয়া থান' থেকে উঠে এলাম।

একাদশীর আগের দিন 'সঁজত', তার মানে "সাজো সাজো" রব। ঘরের দেয়ালগুলোয় মাটিলেপা বাঁ 'ছঁচ্' দেয়া হল। খলায়-খামারে গোবর-লেপা। মা-কাকীমা জেঠা-কাকাদের তদারকিতে ঘরের আশপাশের ঘাস চাঁছা হল, বাবুই ঘাসের দড়ি দিয়ে বসবার 'মাচি' বা জলচৌকি বোনা হল। মা-কাকীমারা সারাদিনই তো গেয়ে গেলেন, "ঘাস চাঁছো রে দাদা মাচি বুনো রে। কাল আসবেক করমরাজা বসবেক রে।।" বা, "হাতি চড়ি আইয়ো ও ইন্দর রাজা। ঘোড়া চড়ি আইয়ো ত করমরাজা।।" ওদিকে বিবাহিতা দিদিরা, বড়পুঁটি-পূর্ণিমা-সুবোধদি, কে পাতিনা কে কুমারডুবি কে ফেঁফা-যুগিডিহায়, বাপের বাড়ি আসার জন্য ছটফট করছেন, "বল মা হামার মন কেমন করে। যেমন শোলমাছে উথালি মারে।" হেলায় অতবড় নদী পেরিয়ে দৌড়ে বাপের বাড়ি আসতে চান, বোনেরাই সেকথা গানের ভিতর দিয়ে জানিয়ে দেয়, "আমপাতা চিরি চিরি লৌকা বনাব লো। এতবড় সবনরেখা হেলকে পাইরাব গো।।" একাদশীর দিন তো আমার, আমার জেঠতুতো ভাই ক্ষিতীশ ও বোনেদের উপোসের দিন। আমি আর ক্ষিতীশ 'করম' আনব, বোনেরা 'পারণ' করবে। তার আগে আছে ফুল তোলা, কঁই-গুজরি-হাগ্‌রি-সরস্বতীরা ফুল তুলতে চলে গেল 'মাঝুডুব্‌কার' বনে। তুলেও আনল কতরকম ফুল—করবলী, গুলাজ, সুরগুঁজা, আকন্দ আর ধানফুল-ঝিঙাফুল। বিকেলে বেলা ডোবার আগে আগে মাদলিয়ার দল সমভিব্যাহারে আমরা চললাম তপোবনের জঙ্গলে 'করম' আনতে, সঙ্গে শাঁখ বাজাতে বাজাতে মেয়েরাও, ছোট ছোট 'ন্যাঙটা-ভুটুঙ সাধের কুটুম'রাও। সবার আগে হ্যাজাক-লাইট হাতে আমাদেরই গ্রামের আনন্দ। কী ফূর্তি! কী ফূর্তি! যদিও মা-কাকীমারা সারাদিনই শুনিয়ে রেখেছেন, "আজ রে ছানাপোনারা বিরি-খিচৌড়ি কালরে ছানাপোনারা দাঁত-গিজৌড়ি।।" কী মর্মান্তিক রোদনের ভবিষ্যৎ বাণী, অশনি সংকেত! আজ যত পার 'বিরি' বা বিউলির ডাল আর চালের খিঁচুড়ি খাও, কাল তো খেতে না পেয়ে দাঁত-কপাটি লেগে পড়ে থাকবে। তা হোক, তবু তো জনারের 'লেটো' তেঁতুলবীচি আর 'মহুল' সেদ্ধ খেতে হচ্ছে না, অন্তত আজ! আমরা চলেছি বিপুল উদ্যমে, তপোবন জঙ্গলমহালের ভিতর দিয়ে, করমঠাকুর আনতে শুধু তো নয়, যেন এক রোদনহারা 'দেশ' আবিষ্কারে, চলেছি তো চলেছি। সঙ্গের 'পারণকারী' পার্বতীবোনেরা গেয়ে চলেছে, "ডহর ডহর রে দাদা ডহর কত ধূর। আমফুল আমফুল দেশ কত ধূর।। লুয়াগড় চাঁদড়া দেশ কত ধূর। ভুলাকানা রতনপুর দেশ কত ধূর।।' কে জানে কত দূর! আমরা তো সীতানালা খালধারের আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা করমগাছের লাল সুতোয় জড়ানো ডালদু'টিকে এককোপে কেটে কাঁধে করে নিয়ে এলাম। এনে আমাদেরই উঠোনে ডালদু'টিকে 'গাড়া' বা পোঁতা হল। মা-কাকীমারা গানের ধুয়ো তুললেন, "আজ রে করমরাজা ঘরে দুয়ারে। কাল রে করমরাজা সবনরেখার পারে।" এবার তো কথকতার পালা। কথক ভরতবুড়ো হাঁক দিলেন,

"কই রে পার্বতীরা!" পার্বতীরা, কঁই-তরু-বিঝল-খুকেন-হাগরি-গুজরি-সোমবারী-ভুট্‌কীরা, আমারই বোনেরা একে একে এসে করমডালের কাছে হাঁটু মুড়ে বসল। তাদের সামনে এখন কাঁসার থালায় টঁকি-ডালা-ঠেকায় রাখা আছে যে-যার হলুদ ন্যাকড়ায় মোড়া 'কাঁকুড়' এক-ঘটি জল এক-ঘটি কাঁচা দুধ আতপ চাল ঘিয়ের বাতি সিঁদুর পোঁটলা আর কাজললতা। শুরু হবে রোদনেরই কথকতা, তবে সে গান নয় অন্য আখ্যান। তারপরে তো 'পাঁতা-নাচ', চলবে সারারাত, সেই ঝিঙাফুল ঝরে যাওয়া ইস্তক। "মানুষ জনম ঝিঙাফুলের কলি গ। সাঁঝে ফুটে সকালে যায় ঝরি।"

পাঁচ

'বন্ধন' বা 'বন্দনা' যে-কোনো একটা শব্দই আমাদের 'বাঁধনা' উৎসবের উৎস হতে পারে। এ উৎসবে গোরুকে খুঁটিতে বেঁধে যেমন নাচানো হয় তেমনি তার শিঙে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে কপালে ধানশিষের 'মৌড়' বা মুকুট পরিয়ে বন্দনাও করা হয়। গোরুই আমাদের ভগবতী। 'বাঁধনা' পরবে মাতা ও গো-মাতার চোখের জল যেন একাকার হয়ে ওঠে!" অহিরে—লদীয়া কিনারে ভালা শিরিগাই চরে রে গুলিনী ত যাছে রে নৈহর। আড় নয়নে ভালা দেখিতে পাওল রে কপিলা ত ছেঁকি ডহর।। গুলিনী বলে অহিরে—না কাঁদ না কাঁদ বাছা শিরমণি গাই রে। পহলা কাত্তিকে ভালা আমাবইস্যা লাগিরে সেহদিন ত আসিব ঘুরিয়েঁ।।" নদীধারে শিরগাই চরে বেড়াচ্ছিল গৃহস্থের। আড়চোখে ঘরের মালিকানকে দেখতে পেল কপিলা, মালিকান বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, বাপের বাড়ি পরবে যাবার জন্য তাঁরও তো চোখের জল কম পড়েনি! কিন্তু মালিকান চলে গেলে 'বাঁধনায়' মূলত গো-পরবে তাকেই বা কে দেখবে, কে তেল-সিঁদুর মাখাবে তার শিঙে! তাই নাছোড় কপিলাও চলল মালিকানের পিছু পিছু। চোখে তার জল ছল্ ছল্! দেখতে পেয়ে মালিকান শিরপাইকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "কাঁদিস না, ১লা কার্তিকে এবছর অমাবস্যা পড়েছে, তার আগেই আমি বাপের ঘর থেকে ফিরে আসব, তোর সেবার কোনো ত্রুটি হবে না।" এ যেন আমারই ন'কাকীমা, তাঁকে তেল-সিঁদুর মাখাতে সাহায্য করছে আমাদেরই গোরু বাগাল জরিলাল।

গোরু-মোষের শিঙে তেল-সিঁদুর পড়ল। গোয়ালঘর, উঠোন, মাঝুঘর গোবর লেপে ঝকঝকে করা হল। তার উপর চালের গুঁড়ি আর ঢেঁড়শগাছের রস মিশিয়ে হাতের আঙুলের অদ্ভুত কারসাজিতে আঁকা হয়ে চলল খুপী-চৌখুপী-আয়তক্ষেত্র-বর্গক্ষেত্র কতসব মনোমুগ্ধকর আলপনাই। আমার নিরক্ষরা ন'কাকীমাই আঁকলেন, আমি বড়জোর তাঁকে এর-বাগান তার-বাগান টুঁড়ে বুড়ো ঢেঁড়শ গাছের রস জোগাড় করে দিয়েছিলাম মাত্র। আলপনার খাঁজে খাঁজে ছড়িয়ে দেয়া হল আঁটি আঁটি 'মড়দা' ঘাস, আর সিঁদুরের টিপ। জ্বেলে দেয়া হল গুঁড়ির প্রদীপ, গুঁড়ির লেচিতে ঘিয়ে

মাখা সল্‌তে গুঁজে। গুঁড়ির প্রদীপ প্রায়শই চুরি হয়ে যায়, আমি থাকলাম পাহারায়। যাদের গায়ে শ্বেতী, বিশেষ করে মেয়েদের, চুরি করে গুঁড়ির প্রদীপ গায়ে মাখলে শ্বেতী নাকি সেরে যায়! গোঠ থেকে ফিরে গোরুমোষগুলো এর উপর দিয়ে 'মড়দা' ঘাস চিবোতে চিবোতে ঢুকে পড়বে গোয়ালঘরে, সেখানেও আঁকা হয়ে আছে আলপনা, তার উপর শিষ হেলিয়ে দুলিয়ে জ্বলছে ঘিয়ের প্রদীপ। 'তাড়ে' 'তাড়ে' অর্থাৎ খাবারের গামলায় মজুত রাখা আছে কানাভরতি আমানি আর খড়ের ভুষি। গোয়ালে গোরু ঢুকলেই 'কাঁচিজিয়রি' করে 'নিম্‌ছানো' 'চুমানো' করবেন আমাদের মা-কাকীমারা, হলুদ জলে পা ধুইয়ে ফের শিঙে তেলসিঁদুর মাখাবেন। 'বাঁটু' নামে আমাদের একটা গোরু ছিল, তার শিঙ দুটো বেঁটে বেঁটে, তাই সে 'বাঁটু'। অমাবস্যার দিন তার চোখে জল দেখে আমার ন'কাকীকে, যদিও মেয়েরা বাঁদনা গীত সচরাচর গান, তবু গাইতে শুনেছি, "কনে ত কাঁদে ভালা জনম জনম যে বাবুহো কনে ত কাঁদে ছয়মাস। (আরে) কনে ত কাঁদে ভালা জনম তাপস যে বাবু হো—বহিনী ত কাঁদে ছয় মাস। পরের বিটি কাঁদে ভালা দেড় পহর রাতি গো সিঁদুরে কাজলে টলমল।।" কেউ কাঁদে জন্ম-জন্মান্তর ধরে, কেউ কাঁদে মাত্র ছ'মাস, সিঁদুরে কাজলে ধ্যাবড়ে কেউ কাঁদে মাত্র দেড় প্রহর রাত। মায়ের কান্না জন্ম-জন্মান্তরেও শেষ হয় না, বোনের কান্না তাও ছ'মাস। পরের মেয়ে অর্থাৎ বউয়ের শোকও কাজলে-সিঁদুরে লেপ্টে মাত্র দেড় প্রহর। বলাই বাহুল্য, সেদিন অতশত কান্নার মানে বুঝিনি। আজল কী বুঝি? যেমন বুঝি না, "কন মরিলে ভালা ঘুরি ফেরিআওয়ে রে কন মরিলে নাহি আওয়ে। বনকেরি কাঠপাত গাঁয়েকেরি আগুন খসি খসি পড়ত আঁগার।। পরব মরিলে ভালা ঘুরিফেরি আওয়ে রে মানুষ মরিলে নাহি আওয়ে। বনকেরি কাঠপাত গাঁয়েকেরি আগুন খসি খসি পড় ত আঁগার।।"

ছয়

আমার বোন হাগরি গুজ্‌রি কঁই সরস্বতীরা টুসুর আদি-অন্ত জানে না, লেখাপড়াও জানে না, তবু টুসুগীতের বেলায়, "অলো ছঁড়ি অলো ছঁড়ি তোর গীতের নাই আগামুড়া। আনলো ছঁড়ি কাগজ কলম লো লিখে দিব সাত জোড়া।" এহেন দাপটটুকু আছে। আমি যতটুকু জেনেছি টুসু নাকি ছিল মাহাতোদেরই মেয়ে। খুবই রূপবতী, বাপ-মা আদর করে তাই নাম রেখেছিলেন 'টুসু'। ভালো নাম একটা ছিল বটে, রুক্মিনী। রুক্মিনীর সঙ্গে এক মাহাতো ছেবলার গভীর ভাব। শুধু কী ভাব, তার সঙ্গে তার বিবাহও স্থির হয়ে আছে। এমন সময় অঘটন, বিধর্মীরা এসে অপহরণ করল দু'জনকেই। হায় হায় করে উঠল সমগ্র মাহাতো সমাজ! বিধর্মী অপহরণকারীদের সঙ্গে আর তাঁরা পেরে উঠলেন না, হাল ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন বাদে অপহরণকারীরাই ছেড়ে দিল দু'জনকে। টুসুকে আর সেই মাহাতো ছোকরাকে। গ্রামে

ফিরে এলো তারা। বিবাহে, দুই হাত এক করতে আর তো কোনো বাধা নেই, কিন্তু বাধ সাধলেন মাহাতো ছোকরার পিতা-মাতা স্বয়ং। যে মেয়ে অপহৃতা, বিধর্মীরা হাত ধরে টেনেছে, সেই মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলবেন কী করে? যা হয়, বিবাহ হল না, মনের দুঃখে বিবাগী হয়ে গেল যুবক। তার খোঁজে দেশান্তরী হল টুসুও। দিন যায়, মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। শুধু কী একটা বছর! বছরের পর বছর। অবশেষে খোঁজ মিলল, আপামর মাহাতোসমাজ শুনল—সুবর্ণরেখা নদীর স্বচ্ছতোয়া জলে হারানো প্রেমিকের খোঁজ পেয়েছে টুসু। তাই তো টুসুগীতে আছে, "জল জল যে কর টুসু জলে তুমার কে আছে। মনেতে ভাবিঞে দেখ জলে শ্বশুরঘর আছে।" বছর বছর টুসু তাই জলেই যায়। সেহেতু টুসুকে নিয়ে রোদনের সংলাপ তৈরি হতে বাধা থাকে না।

কার্তিক শেষ হয়ে পড়ল অগ্রহায়ণ মাস, যাকে বলে 'মউষর' মাস, লক্ষ্মীমাস। গুরুবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ঘরে-দুয়ারে খামারে ধানগাদার নীচে আঁকা হয় আল্পনা, লক্ষ্মীর 'পাঁজ' তার মানে পায়ের ছাপ। আমার বোন-কাকীমারাই আঁকেন। রাতে খাওয়া হয় সরা বা 'খাপ্‌রা পিঠা' আর পাঠ হয় 'বৃহৎ লক্ষ্মীচরিত্র'। আমিই পড়ি, 'বিনন্দ রাখালের জানা' আমার মুখস্থ। অগ্রহায়ণের শেষদিন ঘনিয়ে এলো, আমারই বোন হাগ্‌রি-গুজরি কঁই-সরস্বতী-সোমবারি-তরু-খুকেনরা ফের একত্রিত হয়ে 'চাঁউড়ি' পাতল। মাটির সরার ভিতর কতক গোবরের নাড়ু রেখে তার উপর চালগুঁড়ির জল ছিটিয়ে পাতল টুসুর ঘট। শুরু হল ঘটের সামনে বসে হিমসন্ধ্যায় গাঁদাফুলের পাপড়ি ছড়িয়ে টুসুগীতের মহড়া। প্রমথদার বউ রসনাবালা এবার সেজেছে 'টুসুর মা'। "ষোলো ঘড়ি ষোলো পূজা খা গ টুসু খই ভাজা। তুমার মা ত অভাগিনী কুথায় পাবে দইচিড়া—সে ত যাবার বেলা, খাঞে লে গ দই চিড়া ফুল বাতাসা।।" টুসুর মা টুসু, জননী আর সন্তানের দ্বৈরথ। আকাশের চাঁদ কী আর গাছের ফল যে বললেই পেড়ে এনে দেবে মা? "ছাইলা ছাইলা কর তরা কি জান ছাইলার বেদন। পরের ছাইলা কোলে লিলে গো কেমন করে মায়ের মন।... বল টুসুধন চাঁদ কুথায় পাব গাছের ফল লহে যে পেড়্যে দিব।।" অভাগিনী টুসুর মায়ের সাবান কেনার পয়সা নেই, খেলতে গিয়ে টুসু কাপড় ময়লা করে ফেললে কাচবে কী দিয়ে? তাই খেলতে যাওয়া বারণ, "বাড়ির নাময় শিমলগাছে পায়রা কুহরে গো। পাইখ নয় পাখালি নয় মা টুসু খেলা করে গো।। খেল্য না খেল্য না টুসু কাপড় হবে মলিন গো। তুমার মা ত অভাগিনী সাবন কুথায় পাবে গো।।" পৌষ মাসের প্রতিদিন সন্ধেবেলা টুসুগীতের মহড়া চলল সেই 'বাঁউড়ি'র রাত অব্দি। 'বাঁউড়ি' তার মানে পৌষ বা 'মকর সংক্রান্তি' বা 'মকর সাঁকরাতের' আগের রাত পর্যন্ত। 'সরা' বা ঘট তো আগেই পাতা হয়েছে, সেই অগ্রহায়ণ মাসের শেষদিনেই। এখন তো 'বাঁউড়ি'র আগের হাটে টুসুর মূর্তি কেনার পালা। হাট তো

হাট, 'বাঁউড়ি'র আগের হাট মস্ত বড় হাট! আর টুসুর দোকানই বা কত! হাত দুটো পাতা, হাতের চেটোয় ফুলকারি রং-বেরঙের কাগজ। তার উপর রাঙতা মোড়া, মাথায় কালো চুলে 'বেলকুঁড়ি' কাঁটা। গায়ের রং হলুদ, তায় হলুদমাখা চলে না। "হলুদ বনের টুসু তুমি হলুদ জেনে মাখ না। শাশুড়ি ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।" সেই ফের শ্বশুর ঘর কথা, "হামার টুসু একটি ছাইলা মেদিনপুরে শ্বশুরঘর। কলসির উপর কলসি রাখ্যেঁ পালাঁই আইল বাপের ঘর। পালাঁই আইলি ভাল করলি আর ত বিদায় দিব না। জামাই আইলে ঝগড়া করব গো লাজের বালাই রাখব না।"

কাঁকাল সরু টানা টানা চোখ দেখে একটা টুসু কিনল হাগরি-গুগরি-কঁই-ভুটকী সরস্বতীরা। তবু তো ঘরে আনতেই ওপাড়ার বসুবালারা খোঁটা দিয়ে বলল, "ওদের টুসুর চোখ দুটা পেঁয়াজভাজা তরা যতই সাজা।" ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে পেঁয়াজের কুঁচি ফেলে দিলে যা হয়, কুঁকড়ে-মুকড়ে একাকার। তাই যদি চোখের চেহারা হয় তবে তো মন খারাপ হওয়ারই কথা। মন খারাপ হতে দেখেছি গুজরি-হাগরি-কঁই-সুকেন-তরু-বিঝলদের। তবে তারা বাঁউড়ির রাতে সুদে-মূলে পুষিয়ে দিল। সারারাত ধরে এর 'টুসুঘরে' তার 'টুসুঘরে' উঁকি মেরে টুসু-জাগরণ শুনছি। ব্রাত্য জনের রুদ্ধ রোদন সঙ্গীতে আকাশ-বাতাস নিনাদিত। "আইল রে ঘুন ঘুইনা মাছি পচ্ছিম দিকের বাতাসে। আইলরে সোনার পালকি টুসুধনকে লেগিতে। টুসু লেগবি ভাল করবি টুসু রাখবি যতনে। হামার টুসু শিশুছাইলা শ্বশুরঘরের কি জানে।।" "ই বছরের পৌষ পরবে সবাই পিঁধে লীল শাড়ি। হামার শাউড়ি দুনিয়ার পাপী নাই দিল গো লীল শাড়ি।।" "বাপে বলে ছাড়্যেঁ দিব মায়ের বলে ছাড়ব না। ভাইয়ে বলে ঝিউড়ি ছাইল্যা কাঁদায়ে পাঠাব না।" "মায়ে বলে হেঁ গ বিটি এত জেনে শুখালি। শ্বশুর ঘরের ফপরা মুঢ়ি সেই খাঁয়ে শুখালি।।... আর যাব না শ্বশুরের বাড়ি, কিলাঁই দিল শাশুড়ি।।" "মন ভাঙ্যেছে মিলন হয় কিসে। আমার জড়া ককিল যা ভাঁস্যে।"

সাত

টুসুগীতের জোয়ার এসেছিল, চলে গেল। এখন ভাটার টান। অবলে আমার জেঠতুতো খুড়তুতো ও নিজের বোনেরা বেকার হয়ে গেল না, তারা ফের নতুন উদ্যমে মেতে উঠল। আর কত এর-তার শ্বশুরঘরের, শাউড়ি ননদের কথা বলবে, এবার তো তাদের নিজেদেরও আখের গোছাতে হবে। বয়স হয়েছে, বিবাহেরও মরশুম পড়েছে, যেতে হবে পিত্রালয় ছেড়ে শ্বশুরালয়ে। 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা' আমি পড়েছি, গুজরি-হাগরি-কঁই-সরস্বতীরা পড়েনি। একদিন রোহিনী চৌধুরানি রুক্মিনী দেবী হাইস্কুলের হোস্টেল থেকে ছুটির অবকাশে বাড়ি এসেছি। পড়ার বই

খুলে বসতে যাচ্ছি এমন সময়ই শুনলাম কঁই-হাগরি-গুজরি-সরস্বতীরা আখড়ায় বসেছে! করম, বাদনা, টুসু চলে গিয়েছে, আবার কিসের আখড়া। তারা আমাকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য করে না, নাই করুক, তারা তাদের মতো চলুক, আমি আমার মতো। হঠাৎই শুনলাম, "উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি মাগো। ফিরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি মাগো।। নদী সেপারে কি বাজিলা তুরী মাগো। ঝিঅ গলা বলি আইলা হুরি মাগো।।" আরে এ তো কান্নাগীত! রোদনের বই! গুজরি-হাগরিরা কোত্থেকে পেল! পড়তে পারে না তবু পড়ছে কী করে! এ বই তো 'কাঁদ্ না গীত' 'গেহলা ঝিঅ' 'আদর্শ নারী' নামে মেলায় মেলায় বিক্রি হয়। সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখলাম—বই নেই, এমনি এমনি মুখস্থ বলছে। তাহলে কারুর কাছে শুনে শুনে ইতিমধ্যেই মুখস্থ করে ফেলেছে। বর-কনেকে নিয়ে বেহারারা পালকি তুলল, চলতে শুরু করল, আর থামল না। পিছন ফিরে তোমাকে দেখছি মাগো, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। নদীর ওপারে এই বাজনা বাজছে? মেয়ে চলে যাচ্ছে বলে কী শোরগোল উঠছে? মানেটা এইরকম, বাংলা-ওড়িয়া বা 'হাটুয়া' ভাষায় লেখা। 'শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা'য় পড়েছি, শকুন্তলা কীভাবে তরুলতা হরিণশাবক মহর্ষি কণ্ব ও কিসা গৌতমী অনসূয়া প্রিয়ংবদার কাছে বিদায় নিয়েছিলেন, এ-ও তো তাই। মানে আসছে, "শুকশারি ঝুলে কদম্বডালে এ বাপা। মুহি ঝুলে থিলে তুমর কোলে এ বা পা।।' শুকশারি যেমন কদম্বগাছে বসে থাকে, বাবা, আমিও তো তোমার কোলেই ছিলাম। "আলুপতর কি পান হোইব। পরদেশরে কি মন রহিব।। ঝিপি ঝিপি পানি মুহকু ছাটে। পর ঘর কথা পাষাণ ফুটে বাপা গো।।" কান ঝালাপালা করে উঠল, আমি স্থানান্তরে গমন করলাম। কিন্তু ওই যে, "ঝিপি ঝিপি পানি মুহকু ছাটে" অর্থাৎ মুখের উপর ঝিপিঝিপি জলের ছিটা, পরের ঘরের কথা যেন পাথর হয়ে ফুটে!

সত্যি সত্যিই আমার বোন হাগ্রির বিবাহকাল উপস্থিত হল। ওড়িশা সংলগ্ন বিশ্বনাথপুরে তার বিয়ে হবে। 'হাগ্রি' তো নয়, তার ভাল নাম শকুন্তলা। এ-ও যেন আরেক শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা। ফাল্গুনের কত তারিখে বিবাহ হয়েছিল, আজ আর মনে নেই। বিয়ে হয়ে গেল, এবার বর-কনে বিদায় নেবে, পালকি গোরুর গাড়ি সমূহ উপস্থিত। আর শকুন্তলা, আমার এতদিনের হাগ্রি, সে কী কান্না শুরু করল! আমার ন'কাকীর কাছে বিদায় নিচ্ছে, "উঠিলা সুয়ারী বসিলা নাহি মা গো। ঘুরি চাঁহিবাকু দিশিলা নাহি মাগো।। ভাঙা গাড়িরে কি ছিঁড়া পটিয়া মাগো।। সুয়ারী আইলা বেহারা কাঁহি মাগো।।" নদী সে পারে পারিয়াভাড়ি। অরখিতা ঘরে আনিছি গাড়ি।। গাড়ি যে আছি ন ঝাঁটাই। এমন গাড়ি রে যিনি তো নাহি।।" সেই যে সেই, পালকি উঠছে, চলে যাচ্ছে, ফিরে আর তোমাকে দেখা যাচ্ছে না। ভাঙা গোরুর গাড়িতে কী ছেঁড়া মাদুর পাতা আছে? গোরুগুলোও তেমন শক্তপোক্ত কী? গাড়ি পরিষ্কার না করেই নিয়ে এসেছে, আমি এমন গাড়িতে যাব না মা। ন'কাকার

কাছে, "পাকিলা কদলী ফেনিকি ফেনি বাপা গো। বাপঘর ঝিঅ মউড়মণি বাপা গো।। পাকিলা কদলী ফেনিরে পাচে বাপা গো। বাপ ঘর ঝিঅ ত কোঠরে নাচে বাপা গো।।" পিতৃগৃহের যাবতীয় জিনিসের প্রতি তার যেন মোহ থেকে যাচ্ছে! আমার কেদারদার স্ত্রী ওড়িশার মেয়ে, তাঁকেই এবার জড়িয়ে ধরল শকুন্তলা, "লাল পেঁয়াজ কি রং ছাড়িলা বহু গো। তুম সাঙে মোর মিল ছাড়িলা কি বহু গো।। তুম দাঁতকাঠি তুমে দাঁত মাজিব বহু গো। মোর দাঁতকাঠি চালে গুঁজব বহু গো।। তোর মুড়ি থালা তুমে খাইবা বহু গো। মোর মুড়িথালা রাখি দেবু বহু গো।। তুম বিছানায় তুমে শুইব বহু গো। মোর বিছানা গুটাই দেবু বহু গো।। "আমি জানতাম আমার ন'কাকার মেয়ে হাগ্‌রি তেমন মাথাওয়ালা নয়, তার পড়াশোনাও হল না, সে এত মনে রাখল কী করে! বউদি ওড়িশার মেয়ে, শকুন্তলাকে জড়িয়ে ধরে উপদেশ দিচ্ছেন," গুরুজন আগে চালিবু মথাতলকু পোতি। যে যাহা কহিব সহিবু করি পথর ছাতি।। যেবে তু হোইবু গড়িয়াঘাট পথর পরি। তেবে সিনা ঝিঅ হোইবু ভবে আদর্শ নারী।। পর পুরুষকু দেখিব হাসি ন কহ কথা। হাসি কথা যেবে কহিবু খাই বসিবু মথা।। ঘর কথা কেবে কহিনু নাহি পরদুআর। পরকথা কেবে ন কহ ঝিঅ আপনা ঘর।। তোর লাগি যেবে ন হেব ঘরে কন্দল হুরি। তেবে সিনা ঝিঅ হোইবু ভবে আদর্শ নারী।।" মানে তো পরিষ্কার। গুরুজনদের সামনে মাথা নিচু করে চলবে, যে যা বলবে কঠিন বুকে শুনতে হবে, পুকুরঘাটের পাথরের মতো না হলে 'আদর্শ নারী' হওয়া যায় না। পরপুরুষের সঙ্গে হেসে কথা বলবে না, হেসে কথা বললেই নিজের মাথা খেয়ে বসবে। নিজের ঘরের কথা পরের ঘরে বলতে নেই, পরের ঘরের কথাও নিজের ঘরে বলতে নেই। যদি তোমার জন্য ঘরে কোনো ঝগড়া গণ্ডগোল না হয়, তবে তুমিই হবে 'আদর্শ নারী'। বউদির পালা মিটলে এবার আমার পালা। শকুন্তলা, আর এখন হাগ্‌রি তো নয়, আমার হাত দু'টি ধরল, "আরেন্দা-বারেন্দা সুবর্ণচুড়ি ভাই গো। তুই থিলু মোর সুবর্ণচুড়ি ভাই গো।। সুবর্ণচুড়ি তুই মোর কাঁহিকু গেলু ভাই গো। কাঁচ চুড়িরে তুই বিদায় দেলু ভাই গো।" কাঁচের চুড়িটুড়ি আমি কিছুই দিতে পারিনি, বউদি তবু দুটো উপদেশ দিয়েছিলেন, আমি কেঁদে ভাসালাম।

কবেকার কথা। এখনও যেন শুনতে পাচ্ছি সেই সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী বাছুরখোয়াড়-বড়োডাঙা-নুয়াসাহী-খান্দারপাড়া-দেউলবাড় গ্রামের 'সুবর্ণচুড়ি' বোনেদের গান। কে যেন এইমাত্র গাইতে গাইতে যাচ্ছে, "আমার কাঁদিতে কাঁদিতে জীবন গেল—"

লিটল ম্যাগাজিন পড়ুন ও পড়ান

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ছত্তিশগড় : একটি রিপোর্ট

সুমিত্রা

মধ্যভারতে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের কিছুটা অংশ নিয়ে তৈরি হয় ছত্তিশগড়, ২০০০ সালে। ষোলোটি জেলা নিয়ে গঠিত এই অঞ্চলটিতে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক ও ঘনবসতিসম্পন্ন আদিবাসীদের বাস। ভারতে সবচেয়ে প্রাচীন মানবসভ্যতা এখানেই গড়ে উঠেছিল। যখন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে মানুষের বাস শুরুই হয়নি, তখনও ছত্তিশগড়ের দুর্গম জঙ্গলে আদি ভূমিপুত্ররা বসবাস করছিল—এমনই মনে করেন নৃতত্ত্ববিদরা। এরই একটা অংশ দণ্ডকারণ্য নামে পরিচিত ছিল।

ছত্তিশগড়ের বর্তমান সমস্যা হচ্ছে 'নকশালপন্থী' বনাম 'সালবা জুডুম' দলের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি। অর্থাৎ মূলত আদিবাসী সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব। আসুন দেখি কথাটা কতটা সত্যি।

রমন সিং ছত্তিশগড়ের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। ইনি ২০০৩-এর ডিসেম্বরে নকশাল সংগঠন নিষিদ্ধ করেন। তার কথায় সালবা জুডুম ভালই কাজ করছে। নকশাল অধ্যুষিত অঞ্চলে পীড়িত, সবহারানো গ্রামবাসীদের ত্রাণশিবির করে আশ্রয় দিচ্ছে। সালবা জুডুমের নেতা মহেন্দ্র কারমা বললেন বীজাপুরে প্যারা মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছে। তাতে শিক্ষণপ্রাপ্তরা এস. পি. ও পদে চাকরি পাচ্ছেন। প্রচুর মহিলা এস. পি.ও আছেন। এঁরা সব নকশাল অত্যাচারের শিকার হয়েছেন এক সময়ে। এই শিক্ষণপ্রাপ্তরা সব ল্যান্ড-মাইন বিশারদ। কোথায় কোথায় ল্যান্ড-মাইন পাতা রয়েছে, এরা ঠিক বুঝতে পারেন। এই সবই দেখেছি চ্যানেল 'নিউজ-এক্স'-এ 'ছত্তিশগড়' এর উপর তোলা একটা তথ্যচিত্রে।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজিত যোগী কিন্তু অন্য কথা বললেন। তাঁর কথায়—"সালবা জুডুম সাতশোর উপর গ্রামকে ধ্বংস করেছে; সেখানকার ভূমিপুত্রদের উৎখাত করেছে। এখন ৭০,০০০ এর উপর গ্রামবাসী সব হারিয়ে সালবা জুডুমেরই ত্রাণশিবিরে আশ্রিত। এই ক্যাম্পগুলিতে তারা বন্দির মতো জীবনযাপন করে। এর থেকে বেরোনোর বা উদ্ধারের কোনো রাস্তা নেই।"

এরপর আমরা দেখলাম ছত্তিশগড়ের স্থানীয় শিল্প ও সম্পদ। ভীষণ সুন্দর কাঠের কাজ হয় এখানে। এক সময় বিদেশে রপ্তানিও হত। আসবাব ও ঘর সাজানোর

খুব উন্নত মানের কারুকার্য করা জিনিসপত্র তৈরি করছে আদিবাসী নারী পুরুষ। তা ছাড়া আছে পোড়ামাটির কাজ—মূর্তি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

ছত্তিশগড়ে বিদ্যুৎ এত বেশি উৎপন্ন হয় যে, অন্যান্য রাজ্যে চালান হয়। কিন্তু আদিবাসী অঞ্চলের সব জায়গায় বিদ্যুৎ নেই।

আগে জানতাম তামা, লোহা, বক্সাইট, কয়লা ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র ইত্যাদি খনিজ সম্পদের বিপুল সম্ভার মধ্যভারতের এই অঞ্চলে। যার জন্য ব্রিটিশরা এই অঞ্চলের সম্ভাবনা বুঝেই এখানে প্রচুর রেলপথ তৈরি করে। অনেক খনিও ব্রিটিশ আমলেই চালু হয়। এখন আরেকটা আশ্চর্য বিষয় জানলাম—ছত্তিশগড়ের খনিজ সম্পদের মধ্যে হীরেও আছে! তবু এখানে দারিদ্র্য এত তীব্র!

রাজনৈতিক দলগুলো এই অবহেলিত আদিবাসীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। ভোটের আগে বিজেপি চালের দাম কমিয়ে তিন টাকা করল। আর তার পরদিনই কংগ্রেস ঘোষণা করল দুই টাকা কেজি চাল দেবে। সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি বলল চাল ১ টাকা মাত্র কেজিপ্রতি। এমনই হাস্যকর ও ক্ষণস্থায়ী সমস্ত খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত নেন কংগ্রেস ও বিজেপি দলের নেতারা।

এরপর আলোচনা হল নকশাল আন্দোলন ঘিরে। নকশাল অভ্যুত্থানের মূলে আছে চরম দারিদ্র্য ও দীর্ঘ দিনের অবহেলা। জয় উমেন নামে এক সরকারি সচিব বললেন—'একসময় সরকারি নীতিই ছিল আদিবাসীদের না-ঘাঁটানো; তাদের জীবনযাত্রায় নাক না-গলানো। তাই কোনও সরকারি কর্মচারীদের জঙ্গলে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল, রাস্তা তৈরি ইত্যাদি কিছুই হয়নি। সেই সময়ে মানব সভ্যতার স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে সমান্তরাল সরকার তৈরি হয়—এই প্যারালাল গভর্মেন্ট বা 'জনগণ সরকার'কে স্থানীয় মানুষেরা শ্রদ্ধা করত। নেতাদের 'দাদালোগ' বলত। তারা টাকা জোগাড় করত কনট্রাক্টর ও শিল্পগোষ্ঠীদের কাছ থেকে।

তারা নানাভাবে আদিবাসীদের শিক্ষিত করে তোলার কাজ করত। লেখাপড়া, অস্ত্রচালনা, আত্মরক্ষা। পথ নাটক ও স্কুলের মাধ্যমে ছোট বয়স থেকে একটা আদর্শ শিক্ষা দিত। এই ভাবেই চলছিল। অবশ্যই নকশাল আদর্শ দানা বাঁধছিল আরও জোরদার ভাবে। সেটাই সরকারের শিরঃপীড়ার কারণ। দরিদ্রদের শিক্ষা ও আত্মমর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টাকে সরকার ভাল চোখে দেখেনি। শুরু হল 'নকশাল, বা মাওবাদী' নামের তকমা লাগাকে যেন ভয়ংকর কিছু! এই সময়ে ২০০২— থেকে ২০০৫ এই অঞ্চলে ভয়ংকর খরা হয়। তখন নকশালরা নাকি সরকারি ত্রাণ নিতে অস্বীকার করে। তাতে কিছু গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ হয়। তথ্যচিত্রের কথায়—কিছু গ্রামবাসী নকশাল নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সেই সময়েই বেহরামগড়ের এক গ্রামবাসী মহেন্দ্র বেরিয়ে এসে সালবা জুডুমের নেতৃত্ব দেয়। এসব তথ্যচিত্রের কথা। মহেন্দ্রর কাছ থেকে আমরা অনেক ভালো ভালো কথা শুনলাম—'নিজের মতো বাঁচার লড়াই',

'নকশাল অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো' ইত্যাদি। কিন্তু ছবিতে দেখলাম বন্দুকধারী প্যারা মিলিটারি ফোর্স তৈরি হচ্ছে। এবং স্পষ্টতই ঘোষণা করা হল যে পুলিশ অ্যাক্ট এর ১৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী এরাই পরে পুলিশের পদে নিয়োজিত হবে। প্রাইভেট সেনা থেকে পুলিশ। অদ্ভুত তো!

অর্থাৎ যেটাকে গ্রামবাসীদের নিজেদের মধ্যেকার সিভিল ওয়ার বলে তথ্যচিত্রে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে, তা আদপেই তা নয়। সিভিল ওয়ার হচ্ছে জনগণ বনাম জনগণের লড়াই। কিন্তু এখানে দেখছি পরিকল্পিত সরকারি মদতে গ্রামবাসীদের পুলিশে চাকরির লোভ দেখিয়ে সরকার বনাম আদিবাসী জনগোষ্ঠীর লড়াই তৈরি করা হচ্ছে। কোথায় গেল দরিদ্র আদিবাসীদের স্বনির্ভরতা? তাদের হাতের কাজ, তাদের হীরের খনি? তাদের ভবিষ্যতই বা কী? 'সালবা জুডুম' তৈরি করে সরকার একটা পুরো প্রজন্মকে স্বভূমি থেকে উৎখাত করে ত্রাণশিবিরে আশ্রিত করে ভিখারিতে পরিণত করল না কি? দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষগুলোকে বিদ্যুৎ, রাস্তার মতো পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে রেখে উন্নতির রাস্তা বন্ধ রেখে, ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বদলে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হল সরকার।

চ্যানেল 'নিউজ-এক্স' এ প্রচারিত তথ্যচিত্রই জানালো যে সালবা জুডুম সেনারাও প্রচুর লোক মেরেছে, কিন্তু কোনওটারই এফ. আই. আর পর্যন্ত হয়নি। আদিবাসীদের নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি বলে চালানো হয়েছে। কী চমৎকার ব্যবস্থা! স্থানীয় মানুষকে টাকার লোভ দেখিয়ে সরকারি ভাড়াটে সেনা বানানো হচ্ছে। আবার দরকারে তাদের আদিবাসী পরিচয়টাও কাজে লাগানো হচ্ছে! বাইরের পুলিশ, নকশাল অঞ্চলে ঢুকতে ভয় পায়, তাই এই ব্যবস্থা। আদিবাসীদের অবস্থার উন্নতি করার কোনও জোরদার সরকারি পরিকল্পনাই নেই।

সালবা জুডুম প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষের 'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস' প্রবন্ধটি থেকে কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি—

"উদ্বাস্তু শিবিরে থাকা মানুষের উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রচণ্ড রকম শারীরিক ও মানসিক চাপ সৃষ্টি করছে। মাওবাদীদের নাম এবং তাদের আস্তানা জানতেই এই অত্যাচার চালানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে সহযোগিতা না করলে মাওবাদী বলে জেলে পোরা হবে অথবা এনকাউন্টারের নামে হত্যা করা হবে।

সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র তার নাগরিকদের অধিকার কীভাবে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে হরণ করে, 'সালবা জুডুম' তারই উদাহরণ। এই চিত্র ভারত থেকে ইরাক—সর্বত্র একই। চিত্রনাট্য একটু পালটে যায় স্থান-কাল অনুসারে।

২০০৬-এর মে মাসে হিউম্যানিস্টস্ নন্দিনী সুন্দর ও রামচন্দ্র গুহের নেতৃত্বে একটি দল অনুসন্ধান চালান। তাঁদের রিপোর্টে বলা হয়েছে—

(১) পুলিশ-প্রশাসন বলে রাজ্যে কিছু নেই।

(২) যা আছে তা হল স্থানীয় সালবা জুডুম-এর গুণ্ডারাজ। ওরাই পুলিশ, ওরাই প্রশাসন এবং আইন।

(৩) ছত্তিশগড়ের ছোট শহর নিয়ন্ত্রিত হয় সালবা জুডুমদের দ্বারা।

(৪) 'মাওবাদী-গ্রাম' এই অভিযোগ তুলে কয়েক হাজার গ্রাম পুড়িয়ে, লুটপাট করে, ধর্ষণ করে রাষ্ট্রের তরফ থেকে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে।

(৫) সালবা জুডুমের হাতে মারা গেছেন হাজারের উপর মানুষ। হত্যাকারী সালবা জুডুমের সদস্যদের প্রত্যেকেই হেঁকে-ডেকে হত্যার কথা স্বীকার করেও পার পেয়ে যাচ্ছে।

(৬) কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার হত্যাকারীদের হাত থেকে নাগরিকদের বাঁচাবার চেষ্টা না করে, হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে আইনমাফিক ব্যবস্থা না নিয়ে হত্যালীলা চালাতে উৎসাহিত করছে।"

এরপর ১৫ এপ্রিল ২০০৮ নয়াদিল্লির খবর। নন্দিনী সুন্দর ও রামচন্দ্র গুহর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে অভিযোগের সত্যতা বিচার করতে সুপ্রিম কোর্ট এবার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বা NHRC কে নেতৃত্ব দিল।

১৬ই এপ্রিল 'প্রতিদিন' পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে বলা হচ্ছে "সালোয়া জুডুমের নামে আদিবাসীদেরকে তাঁদের জঙ্গল গ্রাম থেকে জোর করে উচ্ছেদ করে এনে ঘেরা শিবিরে রেখে 'ছিন্নমূল' করে দেওয়া হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মদতে। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে নকশালদের রাইফেলের মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে জোর খাটিয়ে। এই জুডুম শিবিরের অবস্থাও অবর্ণনীয়। অনিচ্ছুক লোকেদের শিবির ছেড়ে জঙ্গলের গ্রামে যেতেও দেওয়া হচ্ছে না আদিবাসীদের।" এসব ঘটনারই তদন্ত চাওয়া হয়েছে।

এরপর কয়েক মাস কেটে গেছে কোনও পরিবর্তনই হয়নি রাষ্ট্র বা কেন্দ্রের নীতির। বরং উত্তর পূর্বাঞ্চলে মণিপুরেও এই কায়দা চালু করার চেষ্টা হচ্ছে। হয়তো অন্য নামে, কিন্তু ব্যাপার সেই একই। স্থানীয় যুবকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে, তাদের দিয়েই প্রতিবাদী আন্দোলনকর্মীদের হত্যা করানো। এতে সবচেয়ে লাভবান ও নিরাপদ অস্ত্র ব্যবসায়ীরা। স্থানীয় শিল্প, সংস্কৃতি, চাষবাস শিকেয় উঠছে। এক কথায় স্বাভাবিক জনজীবন বলে কিছু নেই। এই জঘন্য কাজের মধ্যে যে নোংরা অনৈতিক রাজনৈতিক মানসিকতা রয়েছে, তা বোঝার ক্ষমতা গদিতে বসা বাবুদের নেই। তাদের চামড়া মোটা, চক্ষুলজ্জা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। যাই হোক—সালবা জুডুম তৈরি হওয়ার পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। এতদিন পর গত বাইশ সেপ্টেম্বর ২০০৮, NHRC, অর্থাৎ ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট্স কমিশন-এর রিপোর্ট কে গুরুত্ব

দিয়ে সালবা জুডুমের উপর থেকে সমস্ত রকম সরকারি সহযোগিতা তুলে নেওয়ার আদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সরকার—রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার কি সুপ্রিম কোর্টের আদেশও অমান্য করবে? আমরা দেখছি। অপেক্ষা করছি। সরকারের কি 'আদালত অবমাননা'-র দায়ে পড়ারও ভয় নেই?

যেসব এনজিও-রা এই অঞ্চলে কাজ করে তারা জানে এখানকার মানুষরা সহজ, সরল হলেও এদের বোঝার ও শেখার ক্ষমতা আছে। এরা গরিব হলেও অলস নয়। আর সব চেয়ে বড় কথা এরা না খেয়ে মরে গেলেও কারও কাছে হাত পাতে না। শহরাঞ্চলে গরিব বড়লোক সবাই কথায় কথায় হাত পাতে, উপরি পাওনা আশা করে। কিন্তু কোনও আদিবাসীকে আমরা কোনওদিন ভিক্ষা করতে দেখিনি, চুরি করতে দেখিনি।

একটা আত্মমর্যাদাপূর্ণ, পরিশ্রমী ও সম্ভাবনাময় জনজাতি—যারা সম্ভবত ভারতের প্রাচীনতম জনগোষ্ঠী—তারা কেন ভারতের বাকী অঞ্চলের সঙ্গে সমান তালে এগোতে পারবে না?

উত্তর দিন আমাদের রাজনীতিকরা।

১৮ ডিসেম্বর, ২০০৮ আনন্দবাজারে প্রকাশিত একটি খবর

সালওয়া জুডুমের বিরোধিতায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৭ ডিসেম্বর : ছত্তিশগড়ের 'সালওয়া জুডুম'-এর মতো সংগঠনকে কেন্দ্র সমর্থন করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। এই সংগঠনের হাতে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব দেওয়ার বিরোধিতা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদম্বরম আজ রাজ্যসভায় বলেছেন, "আইনশৃঙ্খলা পরিচালনার দায়িত্ব সরকারের। আমরা সরকার ছাড়া অন্য কারও হাতে এই ক্ষমতা দেওয়ার পক্ষপাতী নই।" সালওয়া জুডুমের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা চলছে। এই সংগঠনের আইনি বৈধতা নিয়েও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করতে চাননি। তবে তিনি বলেন, "রাজ্য সরকারের সমর্থনেই সালওয়া জুডুম ছত্তিশগড়ে সক্রিয় ছিল। কেন্দ্রের ভূমিকা ছিল না।"

দাবি : সামগ্রিক উন্নয়ন

রানা

শিল্পায়ন নিয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে অনেক আলোচনা শুনে আসছি। শিল্পায়নের মাধ্যমে সেই অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি সাধন হয়, এটাও শুনেছি। যে অঞ্চলে শিল্প গড়ে উঠে, সেখানকার আর্থ-সামাজিক চিত্র বদলে যায়। এলাকার মানুষেরা এক উন্নত জগতে প্রবেশ করে। ইত্যাদি ইত্যাদি...। এগুলো আপনারাও শুনেছেন, পড়েছেন। পুরনো কাসুন্দি ঘেটে আপনাদের কান তেতো করতে চাই না। আমি এক শিল্পনগরীর অধিবাসী। জন্ম থেকে কর্ম পুরো জীবনটাই শিল্পাঞ্চলেই কেটেছে। কৃষিজমি দেখেছি। শস্যক্ষেত্র দেখেছি। খেতে শস্য কীভাবে হয় জানি না। জানার চেষ্টাও করিনি। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে কোনটা লাভজনক জানি না। কৃষি নিয়ে কিছুই জানি না। কৃষকের জীবন জানি না। কৃষির উপর গড়ে ওঠা গ্রাম সভ্যতার জীবন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। তাই 'কৃষি, না শিল্প'? কোনটা ভালো বলতে পারব না।

তবে আমি ইন্ডাস্ট্রি বুঝি। কয়লা, স্টিল, কংক্রিট, জুটমিল এই শব্দগুলো আমরা খুব ভালো বুঝি। একটা মালগাড়িতে কত টন কয়লা ধরে, খুব ভালোভাবে জানি। স্টিল, বিদ্যুৎ তৈরির প্রক্রিয়াগুলো আমাদের অঞ্চলের খুব 'কম জানা' মানুষেরাও টেকনিক্যালি অনেক নিখুঁতভাবে বলতে পারবে।

আমি আসানসোল-দুর্গাপুরের মতো এক অতি শিল্পোন্নত অঞ্চলের কথা বলছি। 'কৃষি ভাল, না শিল্প' একথা শুনতে মিডিয়া, বুদ্ধিজীবীরা গ্রামে যেতে পারেন। গ্রামের কৃষিজীবী মানুষদের থেকে শিল্প নিয়ে বক্তব্য শুনতে পারেন। কিন্তু এই মহা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আমরা 'অচ্ছুৎ' থেকে যাই। ভারতের এক অন্যতম শিল্পোন্নত অঞ্চলের মানুষদের কথা কেউ শুনতেই চাই না। কৃষি নিয়ে কৃষিজীবী মানুষেরা বলতে পারেন। কিন্তু শিল্প নিয়ে সবচেয়ে ভালো বলতে পারি আমরা। আমাদের কথা এই বিতর্কে কোনও নূতন মাত্রা যোগ করতে পারে। তবুও আমরা কেন নয়?

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে প্রথম শিল্পায়নের সূচনা হয় আমাদের অঞ্চলে। কয়লা উত্তোলনের মাধ্যমে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে (বিশেষ করে অধুনা ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের) ভূমিপুত্রদের জোর করে বা ভুলিয়ে এখানে এনে কয়লা উত্তোলনের কাজে নিয়োগ করা হয়। তাদের হাত ধরে কোল মাইন শিল্প বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। পরবর্তীতে ওড়িশার প্রান্তিক মানুষেরা ঝাঁকে ঝাঁকে কয়লাখনিতে নামতে শুরু করে। প্রত্যক্ষ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। মাটির উপরেই মূলত তারা কাজ করত। বাউরি, বাগদি, কোড়া

সম্প্রদায়েরা ধীরে ধীরে খনিতে নামতে শুরু করে। একটু উঁচু গোছের বাঙালিরা ইংরেজদের অধীনে করণিক বা বাবুগিরির কাজ করত। বর্তমানে পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টেছে। খনিতে উন্নত গোত্রের (?) বাঙালিদের উপস্থিতিও উল্লেখ করার মতো। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে বেসরকারি মালিকানাধীন সমস্ত কয়লাখনি সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন সংস্থা কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড গড়ে ওঠে। আমাদের অঞ্চলের খনিগুলি ইস্টার্ণ কোলফিল্ড লিমিটেড এবং ভারত কোকিং কোল লিমিটেডের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। সরকারি ব্যবস্থাপনায় অসংগঠিত, অসুরক্ষিত এবং কম বেতনভোগী শ্রমিকেরা সচ্ছল শ্রেণিতে উন্নীত হয়। সরকারি খনিতে এক কায়িক শ্রম দেওয়া মানুষ যা রোজগার করে, তা সেক্টর ফাইভের ঝাঁ-চকচকে অফিসওয়ালাকেও লজ্জায় ফেলে দেবে। লজ্জায় যাতে না পড়েন, তাই বেতন ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার কথা চেপে গেলাম। তবে গত কয়েক বছরে বেসরকারি উদ্যোগে কয়লা উত্তোলন এবং সরকারি খনি বেসরকারি হস্তান্তর শুরু হয়েছে। ফলে কয়লাঞ্চলে এখন দু'টি শ্রেণিবিভাগ গড়ে উঠেছে। সংগঠিত ও অসংগঠিত। এই দুই দলের মধ্যে ব্যবধান কয়েক আলোকবর্ষের। এর নাম নব্য শিল্পায়ন।

এছাড়া স্বাধীনতার পরে পঞ্চবার্ষিকী যোজনার মাধ্যমে দামোদর নদের উপর বিভিন্ন বাঁধ গড়ে উঠতে শুরু করে। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের মাধ্যমে এই অঞ্চলে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়। দুর্গাপুরে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট গড়ে ওঠে। দুর্গাপুর শিল্পনগরীর পত্তন শুরু হয়। স্বাধীনতার আগে বীরেন মুখার্জী কুলটিতে ইস্কো গড়ে তোলেন। কুলটি ও বার্নপুরে ইস্কোর মাধ্যমে স্টিল উৎপাদন শুরু হয়। দুর্গাপুরে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট, হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার, এম.এ.এম.সি., চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, হিন্দুস্থান কেব্‌লস এবং আরও অনেক ভারী শিল্প গড়ে ওঠে। এদের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন অনুসারী শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। দামোদর, জিটি রোড, কয়লা, হাওড়া-দিল্লি রেলপথের উপর ভর করে আসানসোল-দুর্গাপুর এক নূতন শিল্পাঞ্চল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৯১-এ উদার অর্থনীতির হাত ধরে এই অঞ্চলেরও পরিবর্তন হতে শুরু করে। বেসরকারি উদ্যোগে ছোট-বড় কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। বর্তমানে আই টি ও কল সেন্টারেও বিনিয়োগ শুরু হয়েছে।

এতটা পড়ে আপনারা হয়তো চিন্তা করছেন, বর্তমান শিল্পায়নের কথা বলতে গিয়ে পুরনো দিনের কথা কেন? দরকার আছে। পুরাতন শিল্প ব্যবস্থা এবং আধুনিক শিল্পায়ন এই দুটো আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। সন্ধিক্ষণ আমরা দেখেছি। এই রাজ্যে শিল্পায়নের সন্ধিক্ষণে আমরা সবথেকে অভিজ্ঞ মানুষ। এখানকার অভিজ্ঞতা জানানোর জন্য, পার্থক্যটা বোঝানোর জন্য বলার দরকার ছিল।

আমরা শিল্পায়নের পক্ষে ছিলাম। অন্য জায়গায় শিল্পের জন্য জমি দিতে আপত্তি থাকতে পারে। আমরা শিল্পের কথা শুনলে আগ বাড়িয়ে জমি দিতে উৎসুক হই। 'মা-মাটি-মানুষের' মতো একটা কারখানা আমাদের মা। আমরা মাটির গুণ বুঝি না, কিন্তু শিল্পের মর্ম বুঝি।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের কয়েক বছর আগে আমাদের শিল্পাঞ্চলে ভাঁটার টান দেখা যায়। খনি থেকে কারখানা ধুঁকতে শুরু করে। কলকাতার পার্শ্ববর্তী শিল্পক্ষেত্রগুলোতে মানুষ ছাঁটাই এর সাথে পরিচিতি থাকলেও, আমাদের অভিজ্ঞতায় ছিল না। 'স্বেচ্ছাবসর' নামক প্রকল্পের মাধ্যমে এখানকার মানুষও শিল্প থেকে ছাঁটাই হতে শুরু করে। দুর্গাপুরকে একটা সময় বলা হতে শুরু করে ভি.আর.এস. (ভল্যুন্টারি রিটায়ারমেন্ট স্কিম) নগরী। সেই সময়ে বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগে স্পঞ্জ আয়রন কারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। আমরাও উৎফুল্ল হয়ে উঠি। স্বেচ্ছায় কোম্পানিকে জমি দিতে থাকি। পরে কারখানায় উৎপাদন শুরু হলে, চমকে উঠি। তারও পরে গর্জে উঠি। কারখানা আমাদের মা। কিন্তু এ কিসের কারখানা। শিল্পের এ কিসের অত্যাচার? কারখানার কালো ধুলো আমাদের বাড়ির ছাদে, উঠোনে, মাথায়, বাইরে মেলা জামাকাপড়ে। কালো ধোঁয়া ঢেকে দেয় আমাদের গর্বের জিটি রোডকে। ধোঁয়ায় আক্রান্ত হয় আমাদের ফুসফুস। কারখানার বিষাক্ত জল আমাদের সামান্য কৃষিজমি, আমাদের অঞ্চলকে নষ্ট করতে শুরু করে।

এই অবস্থারও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। আমাদের ঘরের পাশের অত বড় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা। কই, আমাদের সেরকম কোনও কষ্ট দেয়নি। তবে এই সামান্য কয়েক একর জুড়ে গড়ে ওঠা ইস্পাত কারখানার এত উৎপাত! শিল্প আমাদের ধাক্কা দেয়।

প্রথমে ছাঁটাই, পরে দূষণ। তখন আমার মনে প্রশ্ন এসেছিল কৃষকেরা তো ছাঁটাই হয় না, তবে শ্রমিকেরা কেন? কৃষিজমিতে দূষণ হয় না, তবে শ্রমিকেরা কেন দূষণের শিকার হয়? শুধু শ্রমিকেরা নয়, কারখানা পার্শ্ববর্তী সকলেই।

২০০০-২০০৭ দূষণের বিরুদ্ধে আমরা গর্জে উঠি। কথার ভুল ব্যাখ্যা যেন না হয়। আমরা শিল্পের বিরুদ্ধে নয়, শিল্পে দূষণের বিরুদ্ধে বলেছিলাম। অহিংস পথে ছিল আমাদের আন্দোলন। হাতে সামান্য ব্লেড ছিল না। কারও ঝান্ডাও আমাদের হাতে উঠে আসেনি। তবুও পুলিশের বীভৎস অত্যাচারের শিকার আমরা হয়েছিলাম। ঘরে ঘরে ঢুকে পুলিশের মারধর, হুলিগ্যানিজমের নামে থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া, এলাকা ছাড়া করা, সবের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তখন আমাদের কথা কেউ শোনেনি। সরকার, প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, মিডিয়া, কেউ না।

খুব সম্প্রতি দুর্গাপুরের মেয়র, বিধায়ক, প্রশাসনিক ব্যক্তি থেকে মন্ত্রী সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন স্পঞ্জ কারখানা গড়তে দেওয়া ভুল হয়েছিল। আর নূতন কোনও কারখানা গড়তে দেওয়া হবে না। কিন্তু পুরনো কারখানাগুলোর দূষণ? সরকারের কুম্ভীরাশ্রু, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের কিছু কেতামাফিক সাবধান বাণী। ব্যস। দূষণ একই জায়গায়। বিষ পান করছি আমরা। তামাম রাজ্য চুপ। পুলিশ, শাসকদল, সরকারের চোখ রাঙানিতে আমরাও এখন বোবা রোগী। রোগ হওয়ার প্রত্যাশায় থাকা শিল্পাঞ্চলের মানুষেরা। শিল্পাঞ্চলের মানুষদের যে শিল্পের বিরুদ্ধে বলতে নেই।

শিল্প হলে প্রচুর মানুষ কাজ পায়। কথাটা পুরোপুরি সত্যি। আমরা তার সাক্ষী। এলাকার জীবনযাত্রার মান প্রচুর উন্নত হয়। আমাদের অঞ্চলে এমন কোনও বাড়ি নেই, যেখানে মানুষ শিল্পের সাথে যুক্ত নয়। কিন্তু এখন নব্য শতকের শিল্পায়ন? আমরা, এলাকার যুবকেরা, শিক্ষিত, ঐতিহ্যশালী দক্ষ শ্রমিকেরা কাজের খোঁজে কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, নয়ডা, পুনে, চেন্নাইতে। আমাদের এখানে এসে আপনি যেদিকে তাকাবেন, সেদিকেই দেখবেন কারখানার ধোঁয়া ওঠা চিমনি বা কয়লাখনি। সেখানে আমাদের কাজ নেই। আমাদের দক্ষ পূর্বপুরুষেরা যে শিল্পভূমি তৈরি করেছিল, তাদের ছেলেমেয়েদের কাজ নেই। শিল্পের অভাব নেই। গত শতকের থেকে এই শতকে আমাদের শিল্পাঞ্চলে অনেক গুণ বেশি বিনিয়োগ হয়েছে। নব্বইয়ের দশকে বন্ধ হওয়া কারখানাগুলো আবার নূতন করে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। প্রচুর কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে বেসরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্পগুলোতে নিয়োজিত হয় বাইরের রাজ্যের মানুষেরা। পানাগড় জাতীয় সড়ক থেকে আসানসোল পর্যন্ত নূতন করে গড়ে ওঠা কারখানাগুলোতে একটা সমীক্ষা করলে দেখা যাবে, ৮০-৯০ শতাংশ মানুষ বাইরের রাজ্যের। এর মাধ্যমে আমি কোনওরকমেই আঞ্চলিকবাদের কথা বলছি না। শুধু জানতে চাইছি এলাকায় নূতন কী কর্মসংস্থান সৃষ্টি হল? এলাকার মানুষেরা কতটা কাজ পেল?

আমাদের দিকে আঙুল তুলে বলা হয়, আমরা নাকি কর্মক্ষেত্রে অযৌক্তিক দাবিদাওয়া করি। ইউনিয়নবাজি করি। আন্দোলন করি। যারা এই অভিযোগগুলো তোলেন, তাদের কাছে আমার একটাই প্রশ্ন, আমাদের অঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য কোন কারখানা বন্ধ হয়েছে?

বরং, আমরা বলতে পারি বন্‌ধের দিনেও আমরা ঝাঁকে ঝাঁকে হাজির হয়ে যাই। যখন ক্ষমতাবান রাজনৈতিক দল বন্‌ধের দিনে আমাদের কারখানা থেকে জোর করে বের করে দেয়, তখনই কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যাহত হয়। রাজ্যের অন্য অঞ্চলে কর্মসংস্কৃতির পরিবেশ অন্যরকম হতে পারে। কিন্তু আমাদের কর্মসংস্কৃতি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে।

বন্‌ধের দিনে মালিক ও সরকার আমাদের কোন নিরাপত্তা দেয়? সুষ্ঠভাবে কাজ করার কোন পরিবেশ রাখে? বরঞ্চ শাসক পার্টির বন্‌ধে ঝামেলায় না পড়ার পরামর্শ পাই। তাহলে অযৌক্তিক বন্‌ধের জন্য উৎপাদন ব্যাহত হলে, দায়িত্বটা কার?

সরকারি উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্পতে কর্মসংস্থানের হার বর্তমান শিল্পায়নের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। তবুও আমাদের অঞ্চলে এখন যেভাবে শিল্প গড়ে উঠেছে, সেখানেও এলাকার প্রায় প্রতিটি মানুষ কাজ পেতে পারে। কিন্তু আমরা পাইনি। 'এলাকার মানুষদের কর্মসংস্থান হবে'—সরকারের এই দাবির যৌক্তিকতা কোথায়?

তবুও একটা অংশ কাজ পেয়েছে। আট ঘণ্টার নামে বারো-চোদ্দো ঘণ্টা ডিউটি। নামমাত্র ওভারটাইম। ছুটি খাতায়কলমে থাকলেও, নেওয়া যায় না। খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন দৈনিক সত্তর থেকে একশো টাকা। কারখানায় সাধারণ শ্রমিকদের

মাসিক বেতন তিন থেকে চার হাজার টাকা। নো-ওয়ার্ক, নো-পে। ন্যূনতম শ্রম আইন মানা হয় না। ঠিকে শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। সাধারণ ধর্মঘটের দিনে শ্রমিকদের ভয় বা লোভ দেখিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা আটকে রাখা হয়। আমরা তো অতীতে এই অবস্থার সম্মুখীন হইনি। খনিতে-কারখানাতে অতীতে সম্মানের সাথে কাজ করেছি। বেসরকারি শিল্পে আমাদের অবস্থা পশুদের থেকে কিছুটা ভাল। খাবারের বদলে টাকা পাই, আর পায়ে দৃশ্যমান কোনও শেকল পরানো হয়নি। তবে একটা শেকল পরিয়ে রেখেছে। ছাঁটাই করে দেওয়ার হুমকি। মাইনে কেটে নেওয়ার হুমকি। **এই নূতন শিল্পায়নকে আজ আমরা অসহায় চোখে দেখছি। এতে কার ভালো হচ্ছে জানি না। দু'শো জনের মধ্যে একশো সত্তর জনের মাসিক বেতন তিন থেকে চার হাজার, বাকিদের কুড়ি থেকে এক লাখের উপর টাকা। উন্নয়ন তাহলে কাদের জন্য? কীসের জন্য?**

মে দিবস, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার বিশেষ দিনটিতে কারখানার গেটের বাইরে লাল পতাকা উড়ানো হয়। স্লোগান ওঠে 'শ্রমিক বিপ্লব জিন্দাবাদ'। তখন ঝাঁ-চকচকে রোডের দু'পাশের পশুখামারগুলির (কারখানা) পশুরা নির্বাক হয়ে জানতে চায়, বিপ্লব কাদের জন্য? নেতাদের শ্রমিক বিপ্লব কোন আদর্শে? শ্রমিকদের জীবনকে আরও পেছনে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য? এর নাম কি শিল্পবিপ্লব?

এই লেখা কোনও ব্যক্তিবিশেষ, কোনও আদর্শ, কোনও আন্দোলনের, বিশেষ করে শিল্পায়নের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। নিজের দেখা ও শোনা অবস্থাটা আপনাদের জানানোর জন্য এই লেখা।

আমরা শিল্পাঞ্চলের মানুষেরা শিল্পের পক্ষে। তবে যে শিল্প মানুষকে পশুস্তরে রূপান্তর ঘটায়, তা কি আমরা চাইব? বন্ধুর মুখে শুনেছি সিঙ্গুরে কারখানা গড়ে তোলার সময়, সুপারভাইজার হিসাবে সে পেত সাড়ে তিন হাজার টাকা। শিল্পের নামে মানুষকে এইভাবে ঠকানো কি কাম্য? শিল্প মানে কি শুধু বিনিয়োগের অঙ্ক? শুধুই বস্তুগত উৎপাদন মাত্রা? শিল্পোন্নয়ন ও মানবোন্নয়ন একই সাথে কীভাবে সম্ভব? শিল্পায়নের সাথে কী মানুষ, পরিবেশ এবং সংস্কৃতির উন্নয়নও সম্পর্কযুক্ত নয়?

আমাদের প্রিয় নেতা-নেত্রীগণ এবং শিল্পপতিরা কিছুদিন 'শিল্প-কৃষির' কবিগান বন্ধ রাখুন না। আপনাদের তরজা অনেক সয়েছি। সহ্যের সীমা বাইরে যাওয়ার আগে নিজেরা সচেতন হোন। এবার একটু চুপ করুন। আমাদের ভোটার নম্বর ভেবে গলাবাজি করা আর আমাদের পছন্দ নয়। আমরা শিল্প-কৃষি শুনতে চাই না। আপনারা সামগ্রিক উন্নয়নের কথা ভাবুন। আমাদের সকলের জন্য দু'বেলা ভাত-রুটি, পরনের কাপড়, মাথায় একটু ছাদ, ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষা, আর খুব সামান্য উন্নত জীবনযাত্রা। ব্যস আর কিছু চাই না। আপনারা শিল্পায়ন, না কৃষির উন্নয়ন কার মাধ্যমে করবেন, সেই দায়িত্ব আপনাদের। আর দায়িত্ব না নিতে চাইলে, আমরা, সাধারণ মানুষেরা তৈরি, নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নিতে।

সেন ডেভলাপার (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

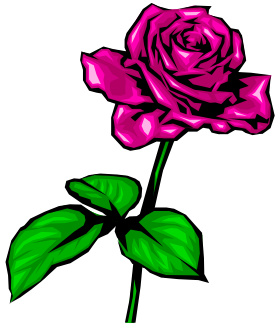

প্রশান্ত সেন, ম্যানেজিং ডিরেক্টর

রেজি. অফিস - ঘোষপাড়া, দক্ষিণ রাজ্যধরপুর

মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর

জেলা - হুগলি

ফোন - 9830508161

সুস্থ কাম

প্রবীর ঘোষ

চিন্তায় এগিয়ে থাকা মানুষদের চোখে প্রাথমিক ভাবে যৌন স্বাধীনতাকে সমর্থন ও যৌন শোষণকে ঘৃণা করাটা গুণ হিসেবে বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। এখানেই উঠে আসে যৌন স্বাধীনতার সংজ্ঞা নিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা।

আমি প্রবীর ঘোষ আমার বাড়ির পরিচারিকা মেয়েটিকে নিয়ে মাঝেমধ্যে বিছানায় শুলে সেটাকে পাঠক-পাঠিকারা কীভাবে নেবে, জানতে ইচ্ছে করছে। আমাকে কি যৌন স্বাধীনতার পূজারি বলে 'হিরো' হিসেবে তুলে ধরবেন? নাকি যৌন শোষণকারী ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত করবেন?

'সুস্থ যৌন স্বাধীনতায় বিশ্বাসীরা আমার এমন চরিত্রকে নিশ্চয়ই ঘৃণা করবেন—এই বিশ্বাস রাখি। সেই সঙ্গে এই প্রত্যাশাও রাখি, তাঁরা নিরপেক্ষ মনের মালিক। নিরপেক্ষ মন নিশ্চয়ই বলে, যে কাজ করাটা আমার ক্ষেত্রে গর্হিত অন্যায়, সে কাজ যে-ই করুক, তা গর্হিত বলেই চিহ্নিত হবে। তসলিমা যদি পরিচারককে মাঝেমধ্যে বিছানায় তোলে, সে কাজকেও ঘৃণ্য বলতেই হবে নিরপেক্ষতার খাতিরে। তসলিমার যৌন-শোষণকে কোনও ভাবেই 'যৌন স্বাধীনতা' বলে চিহ্নিত করতে পারি না। বিষয়টা ভিন্ন মাত্রা পায়, যখন তসলিমা লেখেন, কামনা তাড়িত তসলিমা তাঁর কর্মচারীকে নিয়ে বিছানায় শুতে মা'য়ের মুখের উপর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন; তখন গা গুলিয়ে বমি আসে। এত নোংরা!

তসলিমা তাঁর আত্মকথায় অনেক বিশিষ্ট বাঙালি লেখকদের সঙ্গে তাঁর শারীরিক সম্পর্কের কথা লিখেছেন। লেখকদের নাম উল্লেখ করার মধ্যে কেউ কেউ তাঁর সারল্যের পরিচয় খুঁজে পেয়েছেন?

অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী, গায়ক-গায়িকা, লেখক, খেলোয়াড় ইত্যাদি কিংবদন্তী চরিত্রেরই বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে কোনও দুর্বল মুহূর্তে সম্পর্ক তৈরি হয়। কিন্তু তাঁরা সে-সব নিয়ে বন্ধুদের কাছে রসালো নোংরা গল্প ফাঁদতে বসেন না। আপনার পাড়ার, অফিসের বা আত্মীয় লম্পট মানুষটির বৈশিষ্ট্য লক্ষ করেছেন? করলে দেখবেন, এদের একটা বিশেষ প্যাটার্ন আছে। এরা বাকপটু, স্মার্ট, রসবোধে ভরপুর, টার্গেট করা অপজিট সেক্সদের উপকার করাতে উঁচিয়ে থাকে। এরা যতটা পটাতে ওস্তাদ, ততটাই ওঁচা। পরিচিত, স্বল্প পরিচিতদের বিছানায় তোলার গল্প বন্ধুদের বলে বিকৃত আনন্দ পায়। এই বিকৃত আনন্দ পেতে সত্যি-মিথ্যে সব ধরনের গপ্পো ফেঁদে বসে।

এখানেই রয়েছে সুপারস্টার তরলচিত্রদের সঙ্গে পেঁচি লম্পটদের অ্যাটিচুডের পার্থক্য।

এইসব লম্পটরা যাঁদের নাম প্রকাশ্যে এনে চরিত্রে কাদা মাখায় সেই মানুষরা এর পর আর কোনও দিনই কি লম্পটটির সঙ্গে কথা বলবেন? নিজেও পেঁচি লম্পট না হলে সৌজন্যতার খাতিরেও কথা বলবেন না।

তসলিমা একটি ব্যাতিক্রমী চরিত্র। লেখক হিসেবে যথেষ্ট নাম-টাম হয়েছে, অথচ অ্যাটিচুডে পেঁচি লম্পটদের চরিত্রের সঙ্গে গভীর মিল রয়েছে। ব্যতিক্রমটা এখানেই। তসলিমা তার আত্মজীবনীমূলক লেখায় যাঁদের চরিত্র হনন করেছেন, তাঁরা একই যুক্তিতে তসলিমাকে ঘৃণা করেন। এবং এটাই স্বাভাবিক।

তসলিমার আত্মজীবনীতে উঠে আসা যৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকে কোনও যুক্তিতেই আমরা 'সুস্থ যৌন স্বাধীনতা' বলতে পারি না। প্রেম থাকলে যৌন সম্পর্ক থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শুধুমাত্র যৌনতার প্রতি ভালোবাসা কখনই 'প্রেম' নয়। যৌনতার জন্য যৌনতা'-ই লাম্পট্য, অসুস্থ যৌন স্বাধীনতা যৌন উচ্ছৃঙ্খলা।

প্রেমের পূর্ব-শর্ত

প্রেমের কিছু পূর্ব-শর্ত আছে। বন্ধুত্ব, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সহযোগিতা, মতাদর্শগত মিল এবং স্বনির্ভরতা।

অর্থনৈতিক ভাবে প্রেমিকা প্রেমিকের উপর নির্ভরশীল হলে, অথবা উল্টোটা হলে প্রেমের ভিত খুবই কমজোরি হয়ে পড়ে। আত্মমর্যাদার সঙ্গে, স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখে প্রেমের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে দু-জনেরই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়াটা জরুরি। নতুবা প্রেমের সম্পর্কটা খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে গিয়ে দাঁড়ানোটা শুধুই সময়ের অপেক্ষা।

প্রায় সমগ্র ভারতের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজে আর্থিকভাবে বরের উপর নির্ভরশীল বউদের অবস্থা সাধারণভাবে কম-বেশি একই রকম। 'স্বামী'র অর্থাৎ প্রভুর যৌন স্বাধীনতা এক তরফাভাবে রক্ষিত হয়। যখন ইচ্ছে, যে ভাবে ইচ্ছে ঘরে-বাইরে তার যৌন স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করে।

ধনী ও শিল্পপতিদের পত্নীদের অনেকেই পতির টাকায় যৌন স্বেচ্ছাচার চালায়। মধ্যবিত্ত বউদের একটা বড় অংশই স্বামীর যৌনদাসী হয়ে পড়ে। কারণ ছোটবেলা থেকে মা-ঠাকুমার কাছে 'শিক্ষার' দৌলতে দেহ মিলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে না। সেটা একমাত্র পুরুষের অধিকার। রমণী পুরুষের রমণের জন্য। যে নারী নির্লজ্জের মতো রতি কামনা করে সে ভ্রষ্টা নারী, নষ্টা নারী।

এমন একটা ভাবনা থেকেই বিবাহিতা মহিলারা নিজের স্বাভাবিক যৌন প্রবৃত্তিকে গলা টিপে মারে। যৌন অবদমনের ফলে বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই এই নারীদের যৌন জীবন বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে পরিণত হয়। অবদমিত যৌন আবেগের কারণে অনেকেই psycho-somatic disorder-এর শিকার হয়। 'Psycho-somatic disorder' শব্দের অর্থ 'মানসিক কারণে শারীরিক অসুখ'।

এমন যৌনদাসীদের আরও একটি অংশ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যৌন আবেগকে প্রশমিত করে অন্য পুরুষদের দ্বারা।

অবদমিত যৌন আবেগ থেকে বহু ধরনের অসুখ হতে পারে। যেমন—শরীরের নানা ধরনের যন্ত্রণা, কোনও অঙ্গে অবশতা, হাঁপানি, আলসার, আধকপালি, মাথা ব্যথা, কামশীলতা, পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি। তাই অবদমিত যৌন আবেগ সুস্থ যৌন স্বাধীনতার বিরোধী।

আবার যৌন আবেগ মেটাতে উচ্ছৃঙ্খলা জীবনযাপন পদ্ধতিও সুস্থ সমাজের পক্ষে কাম্য নয়।

আমরা যাদের নিম্নবর্গের নারী বলি, তারা সাধারণভাবে শ্রমজীবী। ইট ভাটা থেকে ছোট কারখানায়, ফুটের সবজি বিক্রেতা থেকে বাড়ির পরিচারিকা ইত্যাদি পেশায় এরা নিযুক্ত। এরা মিলনের সময় সক্রিয় ভাবে অংশ নেয়। বর বেশি শাসন ফলাতে গেলে নতুন মনের মানুষ খুঁজে নিয়ে নতুন সংসার পাতে। স্বনির্ভরতাই এদের যৌনস্বাধীনতার মূল উৎস।

নারীই যখন ঘাতক

শৈশব থেকে কলেজ-ইউনির্ভাসিটির ছাত্রজীবনে আমাদের যারা বন্ধু হয়, তাদের জাত-ধর্ম-সৌন্দর্য অর্থ কৌলিন্য ইত্যাদি বিচার না করেই বন্ধুত্ব হয়। আড্ডা দিতে দিতে, পাঠ্য-নোট আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে, খেলার সঙ্গী হিসেবে, চিন্তা-চর্চার মিল ইত্যাদি থেকে একটু একটু করে বন্ধু হয়ে ওঠে। এই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার মধ্যে নাক খাঁদা, রং কালো, বেঁটে, রোগা পটকা ইত্যাদি বিষয়গুলো বাছ-বিচারে স্থান পায় না। যা পায়, তা হল মানসিক মিল।

এদের মধ্যে 'প্রেম' হয়। শারীরিক মিলনও ঘটতে পারে। কিন্তু বিয়ের প্রশ্ন এলেই সাধারণভাবে তখন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে অন্য কিছু প্রসঙ্গ। মেয়েদের বেশিরভাগই আজও চায় বর হবে বড় চাকুরে বা বড় বিজনেসম্যান। নিজস্ব গাড়ি, সাজানো বিশাল ফ্ল্যাট, বড় ক্লাবের মেম্বার, পার্টি, শপিং মলে কেনাকাটা, আইনক্সে সিনেমা, ডিস্কোথেকের উত্তেজনা, বন্ধুদের সঙ্গে লংড্রাইভ, বেড়াতে গিয়ে তারকাখচিত

হোটেলের সুখ চেটেপুটে উপভোগ—এমনই একটা আয়েসি জীবন। যে ছাত্রীরা জেনে-বুঝেই এমন জীবন চায়নি, তারা ব্যতিক্রমী।

'ধনী' শুধু এই সুবাদে অপদার্থ ছেলেও চায়, তার বউটি হবে 'আইটেম গার্ল' মার্কা। পেয়েও যায়।

তারপর আর কী! বউ থাক। বর থাক। দু'জনের 'যৌন স্বাধীনতা' থাক। এই শ্রেণিরা পোশাক পাল্টাবার মতোই যৌনসঙ্গী পাল্টায়। উচ্চবিত্ত থেকে উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে যৌন স্বাধীনতার চিত্রটা সাধারণ কম-বেশি এই রকম। এরা বহুগামী।

মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও চায় বর হবে তার চেয়ে বেশি শিক্ষিত। মোটা রোজগেরে, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, বয়সে অবশ্যই হবে একটু বড়।

মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরাও চায়, মেয়েটির প্রধান গুণ হবে—সুন্দরী, বরের চেয়ে কম শিক্ষিতা, বয়সে একটু ছোট উচ্চতা হবে একটু কম।

আমরা কি এগোতে চাইব

আমাদের সমাজে আজও পরিবারের কোনও সদস্যের বিয়ে মানেই তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা ঠুনকো সম্মানবোধ, 'স্ট্যাটাস' ইত্যাদি। পাত্র-পাত্রী যে তাদের পছন্দের কাউকে বিয়ে করছে না, 'সম্বন্ধ' করে বিয়ে হচ্ছে—এমন কথা বলতে গর্ব অনুভব করেন বেশিরভাগ পরিবারই। অর্থাৎ পাত্র-পাত্রীর মধ্যে পূর্ব পরিচয় না থাকাটাই যেন গর্বের। অথচ যা উচিত ছিল তা হল, 'পাত্র-পাত্রী দু'জনের বন্ধু'—এই কথাটা বলতে পারার মধ্যে পরিবারের সদস্যদের গর্ব বোধ করা।

সম্পূর্ণ অপরিচিত দু'টি নারী-পুরুষ বিয়ের ফুলসজ্জার রাতেই ভয়ংকর নির্লজ্জ হবে—এটা ভাবতে যে-কোনও প্রগতিশীল মানুষ শিউরে উঠবেন।

যে সময় সন্তান উৎপাদন ও যৌন জীবনের জন্য বিয়ে দেওয়া হত, আমরা কি এখনও সেই সমাজ ব্যবস্থাতেই পরে থাকব?

আমাদেরই কুশিক্ষা দেওয়ার কারণে আজও বেশিরভাগ নারী মনে করেন, স্বামী-পুত্র-কন্যার সেবায় জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেই রয়েছে নারী-জীবনের সার্থকতার প্রাণ ভোমরা। নারী আপনি যখন মা হিসেবে ছেলের জামা-প্যান্ট ধোয়া, ইস্ত্রি করা, স্কুলের টিফিন তৈরি করে গুছিয়ে দেওয়া, জুতোর পালিশ ঠিক রাখা ইত্যাদি কাজগুলো করেন স্নেহময় জননীর মহান কর্তব্য হিসেবে, তখন একবারের জন্যেও কি ভাবছেন আপনার এমনতর কাজ কর্মের ফলে যৌবনে পৌঁছে আপনার ছেলে প্রত্যাশা করবে তার স্ত্রীও এমনি করে গৃহকর্ম ও শিশুপালনের কাজগুলো একা হাতেই সামলাক। সে তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীকে গৃহকর্ম, শিশুপালন ইত্যাদি বিষয়ে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসবে না। আপনার মেয়ে যৌবনে পৌঁছে

আপনার প্রভাবে এটাই ধরে নেবে এসব কাজ করার একক দায়িত্ব একজন আদর্শ স্ত্রী ও মা হিসেবে তারই। এখনও আমাদের সমাজে সাধারণভাবে প্রচলিত, স্ত্রী চাকুরিরতা হলেও তার উপরই বর্তায় গৃহকর্ম ও শিশুপালনের ঝক্কি। এমন এক অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ভাগ পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় যেমন পুরুষদের ওপর বর্তায়, তেমনই কিছুটা দায়ভাগ অবশ্যই নারীদের, যাঁরা এই ধারাকে স্থায়ী রাখার মানসিকতা সন্তানদের মধ্যে তৈরি করে চলেছেন।

নারী প্রাক্ বিবাহিত জীবনে পিতার, বিবাহিত যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীনতা অবনত মস্তকে আজও মেনে চলেছে। পুরুষ-শাসিত এই সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 'কোটিতে গুটিক' নারী বিদ্রোহিনী হয়েছে, শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সোচ্চার হয়েছেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠেরা দীর্ঘকালীন মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে পুরুষের অধীনতা মেনে নেওয়ার মধ্যেই সুখ খুঁজে পেয়েছেন।

বার্ট্রাণ্ড রাসেল একবার তীব্র বিদ্রূপ মেশানো রসিকতায় মন্তব্য করেছিলেন—পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীদের স্বাধীনতা না থাকলেও পুরুষদের ছিল। তারা সুখী ছিল। জনসংখ্যার অর্ধেক সুখী থাকা কম কথা নয়। পরাধীন নারী সমাজের কিয়দংশও অসুখী ছিল না।

এইসব প্রাতিষ্ঠানিক বিয়েতে যেহেতু পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের মধ্যে মতাদর্শগত মিলের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার চেয়ে বস্তু সামগ্রী হিসেবে উভয়কে বিবেচনা করতে বেশি আগ্রহী থাকেন, তাই এই ধরনের বিয়ের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র যৌন স্বত্বাধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়। মতাদর্শগতভাবে মিলহীন, প্রেমহীন, গভীর বন্ধুত্বহীন এমন দেহ-মিলনকে 'সুবিধাবাদী লাম্পট্য' ছাড়া আর কিছু বলে অভিহিত করা যায় কী? এই ধরনের বিয়ে থেকে সাধারণত গভীর ও সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না, গড়ে ওঠে 'রুম মেট' জাতীয় এক ধরনের পরিচিতের সম্পর্ক, যা এক সঙ্গে থাকা, খাওয়া ও ঘুমোনোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এই সম্পর্ক যেহেতু মতাদর্শগত মিল ছাড়াই গড়ে ওঠে, তার স্বামী-রত্নটির জীবনে আর্থিক বিপর্যয় ঘটলে এবং তার দরুন পারিবারিক স্ট্যাটাসের বিশাল রকম পতন ঘটলে স্বামীগর্বে ও স্বামী প্রেমে মাতোয়ারা স্ত্রীর প্রেমও চটকে যায়—প্রায় সব ক্ষেত্রেই এমনটা হয়। এরপরও প্রায় ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক অবশ্যই টিকে থাকে—কিন্তু তা ভালোবাসাহীন, বন্ধুত্বহীন ভাবেই। আর্থিক বিপর্যয়ে প্রেম বিপর্যস্ত হবে—এমন পরিণতি ঘটার সম্ভাবনা কিন্তু মতাদর্শগত মিল থেকে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ক্ষেত্রে শূন্য। মতাদর্শগত মিলন থেকে গড়ে ওঠা সম্পর্ক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ভাঙে না, ভাঙে মতাদর্শের সংঘাতে।

মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন কোনও
আন্দোলন কখনও কোনও শ্রেণীরই মুক্তি
আনতে পারে নি, পারবেও না।

অন্য রকম বিয়ে

গতশতকের ছয়ের দশকের শেষ ও সত্তরের দশকের গোড়ায় রাজনীতি সচেতন বহু প্রেমিক-প্রেমিকা প্রাতিষ্ঠানিক বিবাহ পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নতুনভাবে তাঁদের দাম্পত্যজীবন বা যৌথজীবন শুরু করেছিলেন। নিজের নিজের পার্টি কমিটির কাছে তাঁরা জানাতেন বিয়ে করার সিদ্ধান্তের কথা। পার্টি কমিটির অনুমোদন পাওয়ার পর বিবাহ সভা ডাকা হত। এ সভায় শালগ্রাম শিলা সাক্ষ্য থাকত না, থাকত না কোনও ধর্মীয় মন্ত্র উচ্চারণ। হত না কোনও মালাবদল, শুভদৃষ্টি। নবদম্পতি পাঠ করতেন মাও-সে-তুং-এর কিছু উদ্ধৃতি। উপস্থিত সকলে গান ধরতেন—বিপ্লবী গণসংগীত। আনন্দের অঙ্গ হিসেবে খাওয়া-দাওয়াও হত। এইসব দাম্পত্যবন্ধন যে শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল, এমন নয়। অনেক স্বামী-স্ত্রী এবং প্রেমিক-প্রেমিকা মতাদর্শগত পার্থক্য গড়ে উঠতেই শ্রদ্ধাহীন, বন্ধুত্বহীন, দাম্পত্যজীবন, প্রেমের সম্পর্ক ছিন্ন করে পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেছে।

রাজনীতি সচেতন, আদর্শ সচেতন, মূল্যবোধ সচেতন, আত্মমর্যাদা সচেতন, স্বাধীন মানসিকতাসম্পন্ন দম্পতিদের বিচ্ছেদ তুলনামূলকভাবে অসচেতন ও স্বল্প-সচেতন দম্পতিদের চেয়ে অনেক বেশি ঘটে। দু'জনেই যখন চেতনায় এগিয়ে থাকা, তখন আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দিতেই পারে—সেটা একপক্ষের আদর্শচ্যুতির জন্যেও যেমন হতে পারে, তেমনই আদর্শগত মতপার্থক্য থেকেও হতে পারে। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে 'প্রেমিক-প্রেমিকা' অথবা 'স্বামী-স্ত্রী'র সম্পর্ক অটুট রাখা অবাঞ্ছিত মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক কি?

আমি যে পাড়ায় থাকি, সে পাড়ায় মধ্য বয়স্ক ও বয়স্কদের একটি তাসের আড্ডা আছে। সন্ধ্যায় আড্ডার প্রায় প্রত্যেকেই আসেন, তাস খেলেন, রাতে বাড়ি ফিরে যান। বদলি, স্থায়ী অসুস্থতা ও মৃত্যু ছাড়া আড্ডার কোনও সদস্য বিদায় নেননি, আমার দেখা পনেরোটি বছরের মধ্যে। এই একই চিত্রের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাবেন অন্যান্য পাড়ার তাস বা দাবার আড্ডার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের যুক্তিবাদী সমিতির সভ্যদের ক্ষেত্রে এমন অবস্থা আমরা গত সাত বছরে আদৌ দেখিনি। যখনই কোনও সদস্য লোভ বা ভয়ের দ্বারা চালিত হয়ে সমিতির আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন, আমাদের সমিতির অন্যান্য সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে তাঁর তীব্র দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। পরিণতিতে বিচ্যুতকে অন্য সভ্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হয়েছে। আজ আমার প্রতি যে গভীর বিশ্বাস বা ভালোবাসা সমিতির সভ্য-সভ্যদের আছে, আমি বিচ্যুত হলে সেই বিশ্বাস ও ভালোবাসায় ভাঙন ধরতে বাধ্য। তারও পরে সভ্য-সভ্যদের সঙ্গে আমার অতীত সম্পর্ক অটুট থাকা যেমন অসম্ভব, তেমনই নীতিহীন। তাসের আড্ডার সভ্য এবং আমাদের সমিতির সভ্যদের মধ্যে আদর্শগত সচেতনতার পার্থক্যের দরুনই দ্বন্দ্ব দেখা না দেওয়ার এবং দেখা দেওয়া পার্থক্য আমরা লক্ষ করি। তাস, দাবার আড্ডায় কোনও মতাদর্শগত সংগ্রাম নেই বলেই দ্বন্দ্বেরও সম্ভাবনা নেই। আর আমাদের সমিতির ক্ষেত্রে তীব্রভাবে মতাদর্শগত সংগ্রাম আছে বলেই দ্বন্দ্বও তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই একই ব্যাপার ঘটে প্রেমিক-প্রেমিকা ও স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে।

**আদর্শ সচেতন নর-নারীদের
সম্পর্কের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বর দেখা দেবার সম্ভাবনা
যেমন অচেতনদের তুলনায় বেশি, তেমনই আদর্শগত মত-পার্থক্যের পর
তাঁরা জোর করে একটা দাম্পত্য-সম্পর্ক বজায় রাখবেন—
এটাও প্রত্যাশিত নয়, শ্রদ্ধা আকর্ষণ
করার মতো নয়।**

পাশাপাশি সাধারণ গৃহবধূ নানা ঝড়-ঝাপটা এবং অত্যাচার সহ্য করেও দাম্পত্য সম্পর্ক অটুট রাখতে সচেষ্ট থাকেন, স্বামীর প্রতি অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা এবং আদর্শগত সচেতনতার অভাবের দরুন।

স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে নানা ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে পারে। অনেক সময় মতাদর্শগত মিল থেকে, উভয়ের প্রতি উভয়ের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থেকে গড়ে উঠতে পারে মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক—যেখানে দেহ-মিলন বন্ধুত্বকে আরও সমৃদ্ধতর, দৃঢ়বদ্ধ করতেই পারে। এ মিল স্বত্বাধিকার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, নারী ও পুরুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও বন্ধুত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এমন মিলনই তো সংস্কারমুক্ত মানসিকতার লক্ষণ, সুস্থতার লক্ষণ।

নারীবাদীদের অন্তর্বাস পোড়াবার আন্দোলন

নারী স্বাধীনতা বা নারী মুক্তির নামে ষাটের দশকে অন্তর্বাস পোড়ানোর যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, তারই পরিণতিতে কানাডায় গত শতকের আটের দশকের শেষ প্রান্তে অনুষ্ঠিত হয় নারীদের অভিনব বিক্ষোভ। সে দেশের আইনে পুরুষেরা অনাবৃত বক্ষে প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা করতে পারে, নারীরা পারে না। নারীরা বক্ষ উন্মুক্ত রেখে ঘুরে বেড়ালে অশালীন আচরণের দায়ে পড়তে হয়। এই বৈষম্যের প্রতিবাদে কিছু নারী মিছিল করে পথে নেমেছিল বক্ষ অনাবৃত রেখেই। অর্থাৎ আইন অমান্য।

পাশ্চত্যে নারী মুক্তির আন্দোলনে দেখতে পাই দর্শনের পরিবর্তে ইস্যু ভিত্তিক ধাঁচ। কখনও ওরা নারী মুক্তির দাবি ঘোষণা করেছে অন্তর্বাস পুড়িয়ে, কখনও বা প্রকাশ্যে বক্ষ উন্মুক্ত ও নগ্ন হয়ে ঘোরাঘুরি করার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে নারীর মুক্তিকে আবিষ্কার করেছে। কখনও বা নারীকেই নারীর জীবন সঙ্গিনী হিসেবে বেছে নেবার অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যে স্বাধীনতার পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে। এই নারী মুক্তির নেত্রীরা যেসব দাবি আদায়ের মধ্য দিয়ে নারী মুক্তি আন্দোলন আনবেন বলে মনে করছেন, সেই দাবিগুলো প্রতিষ্ঠিত হলেও বাস্তবে এর দ্বারা নারী সমাজের মুক্তি ও নারী প্রগতির চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়, তবে বলতেই হয় ভারতীয় নারী সমাজের মুক্তি কখনই প্রতিষ্ঠিত হবে না, হতে পারে না। অনাবৃত বক্ষ বা শরীর

নিয়ে ঘোরা যদি নারী মুক্তি ও নারী প্রগতির চূড়ান্ত নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়, তবে বলতেই হয় ভারতীয় নারীরা মুক্ত নারী—কারণ ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষের লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজন মেটাবার মতো কাপড় কেনার সামর্থ্যই যেখানে নেই, সেখানে সংখ্যাগুরু নারীরা যে ব্লাউজ এবং তারও তলায় অন্তর্বাস পরবে না, এটাই স্বাভাবিক। তাদের এই অন্তর্বাস পরিধান না-করা নারী প্রগতি এবং নারী মুক্তিরই সাক্ষ্য বহনকারী ভাবলে তা হবে অযৌক্তিক।

'মুক্তি', 'প্রগতি', 'স্বাধীনতা' শব্দগুলোর সঙ্গে 'মূল্যবোধ' ও 'দর্শন'-এর সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে। আর তাই মূল্যবোধহীন, দর্শনহীন, তথাকথিত নারীবাদী আন্দোলনকে 'উচ্ছৃঙ্খলতা' ছাড়া আর কিছু নামে চিহ্নিত করা যায় না।

সংবাদ

২ ডিসেম্বর ২০০৮

আদিবাসী আন্দোলনের পাশে যুক্তিবাদীরা

বর্ধমান, ১ ডিসেম্বর (সংবাদ) : বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে ক্রমেই ছড়িয়ে পড়া আদিবাসী আন্দোলন নাড়া দিয়েছে এ রাজ্যের নাগরিক সমাজের অন্দরেও। যত দিন যাচ্ছে ততই বেশি বেশি মানুষকে পাশে পাচ্ছে পুলিশ-সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি। এর আগেই আদিবাসী আন্দোলনের কেন্দ্রগুলিতে ঘুরে গেছেন কলকাতার বিজ্ঞজনেরা। তাঁরা সহমর্মিতা জানিয়েছেন আদিবাসীদের। সোমবার এই আন্দোলনের পাশে থাকার কথা জানালো ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ও ভারতের মানবতাবাদী সমিতি। যুক্তিবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক প্রবীর ঘোষ সোমবার বলেন, আদিবাসীদের ওপর দীর্ঘদিন ধরেই নানা ধরনের অত্যাচার চলছে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো সদর্থক পদক্ষেপ কোনো কালেই সরকার নেয়নি। নানা ছুতোনাতায় পুলিশ আদিবাসীদের ধরে এনে নানাভাবে হেনস্থা করছে। তার প্রতিবাদেই এবার আদিবাসীরা সংঘবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। প্রবীরবাবু জানান বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যুক্তিবাদীরা দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করছেন। যুক্তিবাদী বিপ্লব দাসের নেতৃত্বে, তারা আদিবাসী মানুষজনকে কুসংস্কারমুক্ত সুস্থ জীবন উপহার দিতে নিরন্তর চেষ্টা চালাচ্ছেন। আর তাই আদিবাসীদের সমস্যা সম্পর্কে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, আদিবাসীদের আন্দোলনকে একারণেই যুক্তিবাদীরা সমর্থন জানাচ্ছেন। ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুমিত্রা পদ্মনাভনও জানিয়েছেন, মানবতা রক্ষার প্রশ্নে আদিবাসীরা আন্দোলন করছেন। তাঁরা এই আন্দোলনের পাশে থাকবেন।

হোমিওপ্যাথি কতটা বিজ্ঞানসম্মত

সুমিত্রা

২০০৭-এ বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় একটি বিশেষ প্রতিবেদন বেরিয়েছে যাতে লেখক জে. গাইল্‌স হ্যানিম্যানের হোমিও চিকিৎসার মূল পদ্ধতিকে অপবিজ্ঞান আখ্যা দিয়েছেন। প্রথমত, 'বিষে বিষক্ষয়' জাতীয় উপায়ে রোগ সারানো অর্থাৎ রোগকে বাড়িয়ে তুলে তারপর সারানোর যে কথা হোমিও ডাক্তাররা বলে থাকেন, তাকে ভিত্তিহীন বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, যে ভাবে হোমিওপ্যাথি ওষুধ তৈরি করা হয়—বারবার জলে বা স্পিরিটে দ্রবীভূত করে ঝাঁকিয়ে, তার থেকে দশভাগ নিয়ে আবার সেটাকে আরও তরল করে তারপর আবার...আবারও...এভাবে আরও দশবার—তাও অর্থহীন। কারণ এভাবে বার চব্বিশেক তরলীকরণের পরে ওষুধের একটি অণুও অবশিষ্ট থাকতে পারে না সেই দ্রবণে।

কিন্তু আমরা দেখছি তারপরও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি দিব্যি পসার জমিয়ে চলেছে। অন্তত আমাদের দেশে।

যুক্তিবাদীদের কাছে অনেকবারই প্রশ্ন করা হয়েছে—'আপনারা হোমিওপ্যাথি নিয়ে কী বলেন? এটাকে কি বিজ্ঞান বলবেন? কেন এ বিষয়ে আপনারা নীরব?' আমাদের উত্তর ছিল 'এখনও তেমন পড়াশোনা করা হয়নি বিষয়টা নিয়ে'। আমরা নিজেরাও তো দেখেছি মা, বাবাকে, দিদিমা ঠাকুরমাকে—ছোট্ট ছোট্ট গুলি বা পুরিয়া খেয়ে দিব্যি সেরে উঠতে। কারুর জ্বর, সর্দি ভালো হয়েছে তো কারুর বাচ্চার তোতলামি সেরেছে। আবার কারুর দিদার হাতের আঁচিলের মতো গুটি একেবারে মিলিয়ে গেছে। আমরা জানি না, ওষুধ না খেলে ওগুলো নিজে নিজে সারত কিনা। বা কেউ মিষ্টি গুলি ছাড়াও বাচ্চাকে কাশির সিরাপ, জ্বরের ওষুধ খাওয়াচ্ছিলেন কিনা। তবে আমরা দেখেছি এমার্জেন্সি হলে—যেমন হঠাৎ ধুম জ্বর, মাথা ফাটা, পা ভাঙা ইত্যাদিতে কেউ হোমিওপ্যাথি করার কথা মুখেও আনেন না। তাই আমরা অনেকটাই চোখ বুজে ছিলাম।

বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায় রচনা দেখেছি হোমিও চিকিৎসার পক্ষে। ইংরেজি রিডার্স ডাইজেস্টের মতো পত্রিকাও একবার লিখেছিল—পশুদের ওপর হোমিওপ্যাথি ওষুধ প্রয়োগ করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এটা প্লাসিবো হতে পারে

না। গোরুর পায়ে মাদুলি বাঁধার কথা ভেবেছেন কি কেউ? না, কারণ— 'বিশ্বাসের ব্যাপার' পশুদের বেলায় খাটে না। কিন্তু এখন দেখছি এটাও অপপ্রচার। ২০০৫-এ টেলার নামে এক বিজ্ঞানীর লেখায় পাওয়া গেছে—পশুর উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে হোমিওপ্যাথি ওষুধের কোনও প্রভাব পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ খবরটা নেহাতই গল্প, কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়াই মুখে মুখে ছড়ানো হয়েছিল।

আরেকটি মজার পরীক্ষা করেন রবার্টস নামে এক বিজ্ঞানী যেটা নেচার পত্রিকায় প্রকাশ হয় ১৯০৯ সালে। পরীক্ষাটা এরকম—দুটো প্রচলিত কড়া হোমিওপ্যাথি ওষুধ নেওয়া হল। একটি ন্যাট্রিয়াম মিউরিয়েটিকাম থার্টি সি, আরেকটা সালফার থার্টি সি। দুটোই খুব জবরদস্ত ওষুধ। দুটোকেই যথারীতি দ্রবীভূত করা হল। পোটেন্সি বা ওষধিগুণ বাড়ানোর জন্য যেভাবে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বারবার দ্রবণ তৈরি করা হয়, তাও করা হল। এরপর একজন প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি ডাক্তারকে দ্রবণ দু'টি দেওয়া হল। তিনি পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ক্লিনিকাল টেস্ট—যাবতীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করেও দুটো ওষুধকে আলাদা করে চিনতে পারলেন না। অর্থাৎ একটাকে আরেকটার থেকে আলাদা করে কোনটা সালফার আর কোনটা ন্যাট্রিয়াম বুঝতে পারলেন না। তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি দুটোই এক। কোনওটাতেই আর ওষুধের অণুমাত্রও নেই। তাহলে কী আছে? কোন দাওয়াইটা কাজ করে শরীরের ওপর?

আমরা মনে করতেই পারি কোনওটাই না। শরীরের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, 'ওষুধ খাচ্ছি' এই মানসিক সান্ত্বনা, আর ধৈর্য ধরে ক'দিন অপেক্ষা করা। এর সবকটাই সম্ভবত হোমিওপ্যাথি ওষুধের আপাত সাফল্যের কারণ। অনেক অসুখ, যেমন সর্দি-কাশি, অর্শ বা বাতের ব্যথা ইত্যাদি নিজে থেকেই বাড়ে, কমে—সেরেও যায়।

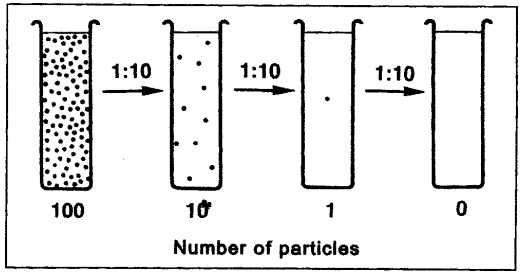

এক সময় মনে করা হত জলে মেশানোর পর দ্রবণে মূল পদার্থকণা কমতে কমতে যখন একটি অণুও থাকে না—তখনও জলে তার 'স্মৃতিটুকু' থাকে। আর এই স্মৃতিই মারাত্মকরকম ক্ষমতাসম্পন্ন। কিন্তু নাঃ। এই থিওরিও নাকচ হয়ে গেছে। ২০০৫-এ নতুন একরকমের স্পেকট্রোস্কোপিক পদ্ধতির সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে 'স্মৃতি' বা যেটুকু 'রেশ' থাকে জলে দ্রবীভূত পদার্থের একটিও অণু না থাকার

পরে—সেটিও মুছে যায় এক ফেমটোসেকেন্ডের মধ্যে। (ফেমটোসেকেন্ড হচ্ছে $১০^{-১৫}$ সেকেন্ড বা এক সেকেন্ডের $\frac{১}{১০০০০০০০০০০০০০০}$ ভাগ)। কাজেই সেই 'মারাত্মক' ক্ষমতাকে বোতলবন্দি করে ধরে রাখার কোনও প্রশ্নই উঠছে না।

সাইলেসিয়া ২০০ খেলে শোনা যায় গলায় ফুটে থাকা মাছের কাঁটা গলে যায়। আমাদের প্রবীরদা কাঁচের প্লেটে সাইলেসিয়া ২০০ নিয়ে, তাতে দিনের পর দিন মাছের একটা ছোট্ট কাঁটা ডুবিয়ে রেখে দেখেছিলেন—কাঁটা যেমন-কে তেমন!

শেষ পর্যন্ত আমরা বলতেই পারি হোমিওপ্যাথি একটি লুপ্ত বিজ্ঞান—যদি বা তা আদৌ কোনওদিন বিজ্ঞান বলে পরিগণিত হয়ে থাকত, আজ সেই ভুল ভেঙে গেছে।

তার একটা বড় কারণ প্রায় দুশো বছর ধরে এই বিজ্ঞান স্থবির হয়ে রয়েছে। এটা নিয়ে কোনও পরীক্ষানিরীক্ষা হয়নি। যা হয়েছে তাতে বরং পুরনো ধারণাগুলো ভুলই প্রমাণিত হয়েছে।

পুরনো জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে এগিয়ে যাওয়া বিজ্ঞানের ধর্ম। যখন আর এগোনো যাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে—আর এগোনোর মতো বা ধারণাগুলোকে প্রমাণ করার মতো কোনও তথ্য নেই, কোনও তত্ত্বও তাই খাড়া করা যাচ্ছে না। তখন বিজ্ঞানের ধারাটার সেখানেই মৃত্যু ঘটে। যেমন ঘটেছে জ্যোতিষ নামক জ্যোতির্বিজ্ঞানের ধারাটির।

জার্মানির ক্যাসেল ইউনিভার্সিটির জীববিজ্ঞান বিভাগের কুটশেরা নামে এক স্কলার মজা করে বলেছেন, আজ যদি হ্যানিম্যান আধুনিক যুগের হোমিওপ্যাথি পরীক্ষায় বসেন, ফুল মার্কস পেয়ে পাশ করে যাবেন, কারণ তিনি তখন যা জানতেন, এখনও তার উপর আর নতুন কোনো সংযোজন হয়নি। কিন্তু চার্লস ডারউইন যদি বিবর্তনবাদ নিয়ে পরীক্ষায় বসেন, ডাহা ফেল করবেন। এখন তার Principle of Descent with Modification by Natural Selection ধারণাটা আরও গতি পেয়েছে, আরও উন্নত, আরও জটিল হয়েছে। ডারউইন সাহেব সব প্রশ্ন বুঝতেই পারবেন না, কারণ নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দগুলোই তাঁর অজানা ঠেকবে। তা সত্ত্বেও ডারউইন তার সময়ে যা প্রমাণ করেছিলেন ও প্রশ্ন তুলেছিলেন তা মানবসমাজের সামনে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল, তিনি পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছেন বিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির।

'হোমিওপ্যাথি' বিষয় হিসাবে তাই বদ্ধ, স্থবির। "একটা ওষুধ—যত কম দেবে তত বেশি কাজ হবে। একেবারে না দিলে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে।" এর থেকে হাস্যকর যুক্তি আর কী হতে পারে! তাই বিজ্ঞানের সিলেবাসে হোমিওপ্যাথির স্থান নেই।

অচেনা রবি

মনীশ রায়চৌধুরী

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লিখতে বসেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ! তাকে নিয়ে নতুন করে লেখার কী আছে? নেই, আবার আছেও।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে জন্মেছিলেন। সারাজীবনে তিনি বহু অসাধারণ কবিতা, ছোটগল্প, নাটক লিখেছিলেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য নোবেল পুরস্কার পান। আর, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কিন্তু শুধুই কী তাই? তিনি কি কেবলই একজন নোবেলজয়ী কবি ছিলেন?

অথচ ২৫ বৈশাখ সকালে ঠাকুরবাড়িই হোক কী আধুনিক এফ. এম. স্টেশনই হোক বা 'কবি প্রণাম' জাতীয় যে অনুষ্ঠানগুলি হয় তার সবেতেই মূল আলোচ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসাহিত্য।

কবিগুরুকে স্মরণের এই পথ ভুল তা আমি বলছি না। কিন্তু এর ফলে তার বিশাল ব্যক্তিত্বের উদার, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী দিকগুলি সম্পূর্ণ অনালোচিত থেকে যাচ্ছে। তাই রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে চর্বিতচর্বণ করার আমার কোনও ইচ্ছা নেই। সে ধৃষ্টতাও আমার নেই। কিন্তু, এই স্বল্প পরিসরে তার বহুমুখী প্রতিভার অন্যান্য দিকগুলি, অর্থাৎ তার শিক্ষানীতি, বিজ্ঞানমনস্কতা, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, সমাজ বিষয়ক চিন্তা প্রভৃতির সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই আমি আমার আলোচনা প্রধানত তার বিজ্ঞানমনস্কতা বিষয়েই সীমাবদ্ধ রাখছি।

'বিজ্ঞানমনস্কতা' শব্দের অর্থ আমাদের অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। বিজ্ঞান নিয়ে গভীরভাবে পড়াশুনো করলে বড় বিজ্ঞানী হয়তো হওয়া যায়, কিন্তু তাতেই বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া যায় না। সেজন্যই আমরা বহু বিজ্ঞানীর হাতে গ্রহরত্নের আংটি দেখতে পাই।

বিজ্ঞানমনস্ক হতে গেলে নতুন জ্ঞানের আলোকে নিরপেক্ষভাবে নিজের অর্জিত জ্ঞানকে প্রতিনিয়ত যাচাই করতে হয় এবং এতে নিজের আজন্মলালিত কোনও বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হলে নির্দ্বিধায় তাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হয়।

তাই আমরা যুক্তিবাদীরা বিশ্বাস করি বিজ্ঞানমনস্ক সাজা যায় না, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন দিকের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে যুক্তিবাদী মনন গড়ে তুলতে হয়। কবির জীবন ছিল এই 'হয়ে ওঠা-র' আদর্শ উদাহরণ। তার পড়াশুনো ছিল ব্যাপক। সেজন্য তার লেখায় দর্শন থেকে বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব থেকে প্রেততত্ত্ব সবই স্থান পেত।

তৎকালীন বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী-র সাথে তার আলাপ ছিল। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) তার বাল্যবন্ধু ছিলেন।

১৮৯৭ সালে ব্রিটেনের রয়্যাল ইনস্টিটিউশনে বেতার তরঙ্গের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল কবি স্বেচ্ছায় তা সংগ্রহের দায়ভার গ্রহণ করেন। সে সময় ঠাকুরবাড়ির অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল। কবি পত্র-মারফত তৎকালীন ত্রিপুরার রাজার কাছে আবেদন জানান। কবির আবেদনে সাড়া দিয়ে তিনি দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বেতার তরঙ্গের ক্ষমতায় সারা বিশ্বকে মুগ্ধ করে দেশে ফিরলে, কবি লিখেছিলেন—

"বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত-শিরে,
পরায়েছ ধীরে।"

বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ, যিনি 'Principle of Uncertainty' এর প্রবক্তা তার সাথেও কবিগুরুর পরিচয় ছিল। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান যাওয়ার পথে তিনি জোড়াসাঁকোতে কবির সাথে দেখা করেন। জগদীশচন্দ্রের ভাগ্নে দেবেন্দ্রনাথ বসুর ডায়েরি থেকে জানা যায় সে সাক্ষাৎকার নেহাতই সৌজন্যমূলক ছিল না।

১৯৩০ সালের ১৪ জুলাই ও ১৯ আগস্ট বার্লিনে কবির সাথে গত শতকের শ্রেষ্ঠ মণিষা আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ হয়। কবি তার সাথে 'Quantum Theory' সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে Tagore-Einstein Council প্রকাশিত 'Confluences of Minds' এর অন্তর্গত 'The Nature of Reality' প্রবন্ধে সেই সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ আছে।

স্বাভাবিকভাবেই, এ সকল প্রণম্য বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বোঝা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব শাখার আবিষ্কার সম্বন্ধে মুক্তমনে জানার আগ্রহই তাকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

তাই, ভক্তির আবেগে ভেসে না গিয়ে রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রকে তিনি যুক্তিনিষ্ঠভাবে নৃতত্ত্বের আলোকে বিচার করেছিলেন। 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের

ধারা' গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন, "নৃতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় বর্বর জাতির অনেকের মধ্যে একেকটি বিশেষ জন্তু পবিত্র বলে পূজিত হয়। অনেক সময় তারা আপনাদিগকে সেই জন্তুর বংশধর বলে গণ্য করে। সেই জন্তুর নামেই তারা আখ্যাত হয়ে থাকে। ভারতবর্ষে এইরূপ নাগবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। কিষ্কিন্ধ্যায় রামচন্দ্র যে অনার্যগণকে বশ করেছিলেন তারা যে এইরূপ কারণেই বানর বলে পরিচিত তাতে সন্দেহ নেই।" স্পষ্টতই বোঝা যায় প্রাচীন মানবগোষ্ঠীগুলির 'টোটেম বিশ্বাস' সম্পর্কে তার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল।

বর্তমান কালে এটা আরও প্রাসঙ্গিক কারণ, দেশের মানুষকে ভক্তিরসে আপ্লুত রাখতে দেশের সরকার থেকে প্রচারমাধ্যম এক অশুভ আঁতাত গড়ে তুলেছে। জীববিবর্তনের চাকা উল্টোদিকে ঘুরিয়ে তারা প্রমাণ করতে চাইছে, আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগের বৈদিক ঋষিগণ যে 'বিজ্ঞান' জানতেন বর্তমান কালের মানুষ তার পাঁচ শতাংশও আয়ত্ত করতে পারেনি। তারা প্রমাণ করতে চাইছে যে রাম, হনুমান, রাবণ প্রমুখ কোনও কাল্পনিক চরিত্র নয়। তাই দু'দিন অন্তর টি.ভি. চ্যানেলগুলি রামায়ণ মহাভারতের একেকটি নিদর্শন আবিষ্কার (!) করছে। কেন্দ্র সরকার ও গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে 'সেতুসমুদ্রম' বিতর্ক ধামাচাপা দিতে 'আর্কিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া'-র দুই আধিকারিককে সাসপেন্ড করে। কারণ তারা বলেছিলেন রাম একটি কাল্পনিক চরিত্র।

যে তথাকথিত 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশে এখনও রামজন্মভূমি রাষ্ট্রীয় সত্তা দখলের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, সেখানে তিনি ১৯১২ সালে একথা লিখে গেছিলেন ভাবলেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়।

প্রেততত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রেও আমরা তার মুক্তমনের পরিচয় পাই। পরলোকতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। অজানাকে জানার আগ্রহেই তিনি প্ল্যানচেটের আসরে যোগ দিতেন।

এ বিষয়ে মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি যা বলেছিলেন তা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ১৯২৯ সালের ৪, ৫, ৬, ৮, ২৮, ২৯ নভেম্বর ও ১৬ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে প্ল্যানচেটের আসর বসেছিল। মিডিয়াম ছিলেন উমাদেবী।

৬ নভেম্বর, ১৯১৯-এ রাণি মহলানবীশকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, "উত্তরগুলো শুনে মনে হয় যেন সে-ই (মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিদেহী আত্মা) কথা কইছে। কিন্তু এসব বিষয়ে খুব পাকা প্রমাণ পাওয়া যায় না।" পূর্বোক্ত আত্মা কবির প্রশ্নের উত্তরে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে জানান, "কারও বা ঝড়ের হাওয়ার মতো কারও বা ফুরফুরে হাওয়া।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, স্বামী অভেদানন্দ 'মরণের পারে' গ্রন্থে লিখেছেন আত্মা নির্দিষ্ট ভর বিশিষ্ট ঘন কুয়াশার মতন পদার্থ যার ছবি তোলা সম্ভব। এ-সকল তথ্যের গরমিলের জন্য কবি পরবর্তী কালে প্ল্যানচেটে বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে ইউরোপ ভ্রমণকালে বিশেষত রাশিয়ায় থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদের সাথে পরিচিত হন। এর ফলে জীবনের শেষ দশ বছরে কবির চিন্তায় বারংবার ঘুরেফিরে এসেছে যুক্তিবাদী নিরীশ্বরবাদী চিন্তা। 'অচলায়তন', 'চতুরঙ্গ', 'ধর্মশিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা তারই পরিচয় পাই। মাদুরাই-এর মন্দিরে ঠাকুরের লক্ষ লক্ষ টাকার অলংকার দেখে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন, "কত লক্ষ লক্ষ লোকের দৈন্য অজ্ঞান অস্বাস্থ্য ওইসব গহনার মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।" তিনি অনুভব করেছিলেন, মানুষের অজ্ঞানতাকে ব্যবহার করে নিজেদের ধন অর্জনের পথ মসৃণ করার জন্যই বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় শিক্ষার গতিরোধ করে দাঁড়াচ্ছে।

'ধর্মশিক্ষা' গ্রন্থে তিনি লিখছেন, "কারণ বিদ্যা যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকে ততই সে প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রের সীমাকে চারিদিকেই অতিক্রম করিতে উদ্যত হয়।" ফলে শাস্ত্রের ভুল জনসমক্ষে প্রকাশিত হতে থাকে। "কিন্তু ধর্মশাস্ত্র যদি স্বীকার করে যে, কোনও অংশে তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত তবে তাহার প্রতিষ্ঠাই চলিয়া যায়। কারণ সে বিশুদ্ধ দৈববাণী এবং তাহার সমস্ত দলিল ও পরোয়ানার উপর স্বয়ং সর্বজ্ঞ দেবতার শীলমোহর স্বাক্ষর আছে—এই বলিয়া সে আপন আসন পাকা করিয়া আসিয়াছে।" এরপর রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

দেশে বিজ্ঞানের সামগ্রিক প্রচারের ক্ষেত্রেও তার মতামত লক্ষণীয়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, "সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন নামক একটা কল জুড়িয়া দিলেই" সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে না। এ বিষয়ে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স' এর প্রতিষ্ঠাতা শ্রী মহেন্দ্রলাল সরকারের সাথে তার মতভেদ ঘটেছিল।

কবি ইংরেজ পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যেই বিজ্ঞান চেতনার অভাবের মূল কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। তার মতে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করি তা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোনও কাজে লাগে না। তাই "যে সিন্দুকের মধ্যে আমাদের আপিসের শামলা এবং চাদর ভাঁজ করিয়া রাখি সেই সিন্দুকের মধ্যেই আমাদের সমস্ত বিদ্যাকে তুলিয়া রাখিয়া দিই।" এর ফলে "দেখা যায় একই লোক একদিকে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন।"

তৎকালীন যে-সকল শিক্ষিত অথচ গোঁড়া ধার্মিক ব্যক্তি হিন্দুধর্মের সকল সংস্কারকে বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে করতেন, তাদের ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

"পণ্ডিত বীর মুন্ডিতশির প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা
নবীন সভায় নব্য উপায়ে দিবেন ধর্মদীক্ষা।
কহেন বোঝায়ে, কথাটি সোজা এ হিন্দু ধর্ম সত্য—
মূলে আছে তার কেমিস্ট্রি আর শুধু পদার্থতত্ত্ব।

টিকিটি যে রাখা ওতে আছে ঢাকা ম্যাগনেটিজম শক্তি
তিলক রেখায় বিদ্যুৎ ধায় তাই জেগে ওঠে ভক্তি।
সন্ধ্যাটি হলে প্রাণপণ বলে বাজালে শঙ্খ ঘণ্টা
মথিত বাতাসে তাড়িত প্রকাশে সচেতন হয় মনটা।
এম-এ ঝাঁকে ঝাঁকে শুনিছে অবাক অপরূপ বৃত্তান্ত
বিদ্যাভূষণ এমন ভীষণ বিজ্ঞানে দুর্দান্ত।"

সেজন্য শান্তিনিকেতনে তিনি ন্যায়শাস্ত্র, তর্কশাস্ত্রের ন্যায় অসার শিক্ষাকে বাতিল করে যুগোপযোগী কর্মমুখী শিক্ষার প্রচলন করেন। এ বিষয়ে তার সাথে বিদ্যাসাগরের মতের মিল লক্ষ করা যায়। যিনি ১৮৫৩ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে ব্যালেন্টাইনকে লেখা এক চিঠিতে বেদান্ত ও সাংখ্যকে "সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত দর্শন-পদ্ধতি" বলে উল্লেখ করেছিলেন। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় (যিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা) রবীন্দ্রনাথও দেশবাসীকে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কারণ তাহলেই বিজ্ঞান সাধারণের ঘরে পৌঁছাবে এবং "তাহা হইলেই বিজ্ঞানসভা সার্থক হইবে"।

কবি প্রায় একশো বছর আগে একথা অনুভব করেছিলেন। অথচ, আমরা সেইপথে এগোতে পেরেছি কি?

ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি নিজেকে চিরকাল সকল প্রকার স্থূল কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন। হিন্দুসমাজের জাতিভেদ প্রথা চিরকালই তাকে পীড়িত করেছে। কবির মতে, "যথার্থ ভারতবর্ষ মহা ভারতবর্ষ। মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের ছাঁটাকাটা হাড় বের করা শুচিবায়ুগ্রস্ত ভারতবর্ষ নয়।"

অস্পৃশ্যতার নামে মানবতার অপমানকে তিনি কখনো সহ্য করেননি। মহাত্মা গান্ধীর মতো আরও অনেক ব্যক্তিত্বকে তিনি এই লড়াইয়ে পাশে পান। সমাজে নারীর অবস্থান নিয়েও তাঁর ভাবনাচিন্তা কতটা এগিয়ে থাকা, তা তাঁর গল্প উপন্যাসে নারী চরিত্রদের দেখলেই বোঝা যায়।

কবি নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সমভাবে শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন স্বামী-স্ত্রী শিক্ষায় পার্থক্য থাকলে তাদের চিন্তাধারা কখনোই মিলতে পারে না। ফলস্বরূপ, "দাম্পত্যে অনেক প্রহসন এবং সম্ভবত অনেক ট্র্যাজেডিও ঘটে থাকে।" তাই তিনি লিখেছেন, "মেয়েরা যদি কান্ট-হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দুরছাই করিবে না।"

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন বঙ্গভঙ্গ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে লেখায় আমরা তার পরিচয় পাই। বাল গঙ্গাধর তিলক, হেগড়েওয়ার, সাভারকর প্রমুখ নেতাদের হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গী তিনি কখনোই মেনে নিতে পারেননি।

কংগ্রেস 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীত করতে চাইলে মুসলীম লীগ তার তীব্র বিরোধিতা করে। কবি স্পষ্টভাষায় জানিয়েছিলেন, "'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের কেন্দ্রস্থলে আছে দুর্গাস্তব" তাই "যে রাষ্ট্রসভা ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মিলনক্ষেত্র সেখানে এই গান সার্বজনীনভাবে স্বীকার করতে পারে না।" এটাই ধর্মনিরপেক্ষতার সর্বাধুনিক সংজ্ঞা নয় কি? পরে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র গ্রামোন্নয়নের বিষয়ে মনোনিবেশ করেন।

সেকালে অভিজাত বংশের সন্তানরা বিদেশে ব্যারিষ্টারী বা ICS পড়তে যেত, সেখানে তিনি স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও জামাই নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে 'কৃষিবিদ্যা' বা Agronomy পড়তে পাঠান, যাতে বাংলাদেশের কৃষকরা উন্নত বিজ্ঞানসম্মত কৃষিব্যবস্থার সুবিধালাভ করতে পারে। তারই প্রচেষ্টাতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম 'কৃষিবিদ্যা' বিভাগটি চালু হয়। ঠাকুরবাড়ির খয়রা এস্টেটের টাকাতে বিভাগটি চলত।

এছাড়াও, সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের রক্ষার জন্য তিনি 'কৃষি সমবায়' গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছিলেন।

বর্তমান ভারতবর্ষের ২৪০টি জেলার কয়েক হাজার গ্রামে, বাংলাদেশে, ভেনেজুয়েলা, নেপাল প্রভৃতি দেশে 'স্বয়ম্ভর গ্রাম' গঠনের মাধ্যমে হতদরিদ্র মানুষেরা যে শোষকের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছে তার রূপরেখাও আমরা রবীন্দ্রনাথের 'সমবায় নীতি'-তে পাই।

রবীন্দ্রনাথের কালোত্তীর্ণ চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের সুরে বলতেই হয়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার প্রথম 'ইয়ং বেঙ্গল'।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধামুয়ায় স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী

যুক্তিবাদী সমিতির ধামুয়া শাখা গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০৮, মহিলাদের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী তৈরির কাজ শুরু করল। সোনালী কয়াল ও শিপ্রা কয়ালের নেতৃত্বে নিজের বাড়ির লাগোয়া অংশে কাঠামো তৈরি করে তাতে কাপড় লাগিয়ে কাপড়ে জরির কাজ, পুঁতি ও পাথর বসানোর কাজ শুরু করল ধামুয়া অঞ্চলের বেশ কয়েকজন মহিলা। একসঙ্গে পালা করে জনা পাঁচ ছয় কাজ করতে পারেন। একেকটি কাপড়ের কাজ শেষ করতে লাগে ৩ থেকে ৬ দিন।

অভিনন্দন সোনালী ও শিপ্রাকে। এই উদ্যোগের পেছনে ধামুয়া শাখার মৃণালের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা গর্বিত।

একটি ভূতের কাহিনি

প্রবুদ্ধ বাগচী

জীবিকাসূত্রে শহর কলকাতা থেকে পঁয়ষট্টি কিলোমিটার দূরের এক আধা গ্রাম-আধা মফঃস্বলে আমাকে নিয়মিত যাতায়াত করতে হত। সারাদিনের কাজ সেরে সন্ধের ট্রেনে বাড়ি ফিরছিলাম। ট্রেন এসেছে নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে। এই লাইনে এটা গা-সয়ে যাওয়া ব্যাপার। যে কামরায় উঠে বসেছি সেটায় আলো পাখা পর্যন্ত নেই। একটা স্টেশন পার হওয়ার পরই আটকে গেল ট্রেন। প্রবল ঝড়, সেইসঙ্গে শিলাবৃষ্টি। জানলার ধার ঘেঁষে বসেছিলাম, কিন্তু খেয়াল করিনি, কামরার আলো পাখার মতো জানলার পাল্লাগুলোও উধাও! অগত্যা ঘুটঘুটে অন্ধকারে বৃষ্টির ছাটে ভিজে সপসপে হওয়া ছাড়া গতি কী?

সেই ঘোর অন্ধকারে মোমবাতি জ্বালিয়ে দু-চারজন হকারের ইতস্তত হাঁকাহাঁকির মধ্যেই আমার উল্টো দিকের দু'জন বয়স্ক ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন ভূতের গল্প। নান্দনিক ভাবে, অমন অন্ধকার আর বৃষ্টিভেজা আচ্ছন্নতায় ভূতের গল্পের মতো উপাদেয় আর কী-ই বা হতে পারে? বলা বাহুল্য, ট্রেনের নিশ্চলতায় বিরক্ত আর শঙ্কাতুর আমার পক্ষে বেশ একটা বিনোদনের উপকরণই হয়ে উঠল এই ভৌতিক কাহিনির বিস্তার।

আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিটেরও বেশি খুব নিবিড় হয়ে গল্প শোনার পর যখন আবার ট্রেন নড়ে বসে এগিয়ে চলল তখন চোখের সামনে আবছা-আঁধার পেরিয়ে বৃষ্টিভেজা নিসর্গ সরে সরে যাচ্ছে পেছনের দিকে। মনে হচ্ছিল, শুধু বিনোদন নয়, এইসব ভূতের গল্পের মধ্যে কোথাও হয়তো কিছু ভাবনার সূত্রও থেকে গেল। ততক্ষণে, আমি জেনে গেছি ওই দুই অফিস ফেরত মধ্যবয়স্ক সহযাত্রীর শৈশব-কৈশোর কেটেছে গ্রামের পরিবেশে। কিন্তু এখনও গ্রাম তাঁদের সঙ্গ ছাড়েনি। তাঁদের কথাবার্তায় স্পষ্ট হয়েছে, ভূত নিয়ে এসব কাহিনি—কিংবদন্তীর চর্চা নিছক গালগল্প নয়—এসব কাহিনিকে তাঁরা সত্যি বলে মানেন। বিশ্বাস করেন, ভূতপ্রেত নিশ্চিত-ই আছে, গায়ের জোরে বা ফুৎকারে তাদের উড়িয়ে দেওয়া যাবে না। খেয়াল করছিলাম, এ-সমস্ত কথা জোর দিয়ে বলে তাঁরা নিজেদের বিশ্বস্ততার জায়গাটা একটু একটু করে ঝালাই করে নিচ্ছেন! কবে কোন অন্ধকার পুকুরপাড়ে কাপড় কাচতে গিয়ে কোনো অশরীরী নারীমূর্তিকে দেখা গিয়েছিল, গ্রামের পথে জোছনা রাতে খোনাগলায়

কে কেঁদে উঠেছিল, শ্মশান ঘাটের কাছে একটা কালো বিড়াল হঠাৎ অশ্বত্থগাছ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল—এরকম সব অজস্র ঘটনা তাঁরা বিশ্বাস করেন এবং তা প্রকাশ্যে বলতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করেন না!

সবাই জানেন, বিশ্বাস ব্যাপারটাই খুব গোলমেলে। কল্পনার তবু একজোড়া ডানা থাকে, সেটা নিয়ে যেখানে সেখানে উড়ে বেড়ানো যায়। কিন্তু, বিশ্বাস পলিতে আটকে যাওয়া ডিঙি নৌকোর মতো, তার কোনও গতি নেই। অযোধ্যায় রাম-জন্মভূমি নিয়ে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি করে রামপন্থী মৌলবাদীরা বলেছিলেন, রাম যে ওইখানে জন্মেছিলেন এটা অধিকাংশ হিন্দুদের বিশ্বাস, দেশের সর্বোচ্চ আদালতও নাকি সেই বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আমাদের পরম স্যেকুলার রাষ্ট্রে সবার ওপরে বিশ্বাস সত্য তাহার ওপরে নাই!

ত্রৈলোক্যনাথ-কথিত পুঞ্জীভূত অন্ধকার থেকে ভূতের নির্মাণের চমৎকার তত্ত্বটা অনেকেই জানেন। সেই অন্ধকার নিছক বিজলিবাতির অভাবজনিত অন্ধকার নয়, সামাজিক চেতনার তামসিকতাও তার শরিক, শরিক নানা কুসংস্কার ও কুসংস্কৃতির আগাছা। কিন্তু প্রগতির গর্বে উদ্ধত আমাদের চেনা সমাজের বাসিন্দাদের মধ্যেও এই স্থবিরতাকে ঠিক কেমনভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে?

ভাবনাটাকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে ধরে ওই দুই নাগরিকের অবস্থানটাকে আরও খুঁটিয়ে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক, মধ্যবয়স্ক ওই দুই সহ-নাগরিক সত্যিই গ্রামে তাঁদের শৈশব-কৈশোর কাটিয়েছেন। সময়ের হিসেব ধরলে সেটা চল্লিশ বছর আগের কোনও সময়। পরে জীবিকার প্রয়োজনে তাঁরা সরে এসেছেন শহরের জলহাওয়ায়। ইতিমধ্যে গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ একটা গড়পরতা সমৃদ্ধির মুখ দেখেছে। শহর কলকাতার পঞ্চাশ ষাট কি একশো কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যে নাগরিক উপনিবেশ, তার মধ্যবিত্ত ভদ্রপাড়ায় প্রতি পরিবারে প্রযুক্তির আশীর্বাদ পৌঁছেছে। কুকিংগ্যাস, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন এমনকী মোবাইল ফোন, ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ও ওভেন আজ প্রায় নিত্যব্যবহার্যের তালিকায় ঢুকে পড়েছে। আমাদের আলোচনার ওই দুই চরিত্র হয়তো এইসবগুলি বা বেশিরভাগগুলির মালিক এবং একটা পরিবর্তন যে ঘটছে সেটা এঁরা টের পান। এঁদের পরের প্রজন্মের কাছে গ্রামের কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। থাকলেও গ্রামের সামাজিক পরিবেশটাও আর আগের মতো নেই।

অন্ধকার বটগাছতলায় বা নির্জন পুকুরপাড়ের ঝোপে অশরীরী আত্মার দেখা পাওয়া আজ আর খুব একটা সম্ভব নয়। যেটা সম্ভব, সেটা হল বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে ডিভিডি-তে বা কেবল টিভি-বাহিত বিদেশি চ্যানেলে হরর ফিল্ম দেখা! কিন্তু সে তো নিছক বিনোদন, তার সঙ্গে বিশ্বাসের সংযোগ থাকা উচিত নয়। হয়তো নয়, তবু কোথাও একটা যোগসূত্র থেকেই যাচ্ছে।

আর, এমনটা ঘটছে বলেই অনেক কিছু হিসেব যেন উল্টে-পাল্টে যাচ্ছে। এই কলকাতা শহরেই এমন পরিবার আছেন যেখানে আর্থিক প্রতাপে প্রযুক্তির আয়োজন ষোলোকলার ওপর আঠারো কলা, অথচ সেইসব পরিবারেই জাঁকিয়ে বসে আছে পরলোকতত্ত্ব; তাবিজ-কবচ-মাদুলি দিয়ে সেখানে প্রতিহত করার চেষ্টা হয় বাধাবিঘ্নকে আর ফ্রেন্ড ফিলজফার গাইড হিসেবে পারিবারিক তান্ত্রিক জ্যোতিষীরা তো আছেনই! ট্রেনে দেখা ওই দুই সহযাত্রীর প্রেতচর্চা বরং অনেক অকপট।

জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, শ্রমিকের মুক্তির লক্ষ্যে যিনি নিরন্তর গলা ফাটান তিনি গলার উপবীতকে যত্নে লালন করেন এবং শনি মঙ্গলবারে নিরামিষ খান, এই দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতে গ্রামে যাওয়ার কোনও দরকার নেই। এই আগমার্কা প্রগতির রাজ্যে এমন অনেক বিজ্ঞানের জাঁদরেল অধ্যাপক আছেন যাঁরা দু-হাতের দশ আঙুলে উনিশরকম রত্নধারণ করে 'মহাজাগতিক বিকিরণ' থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন এবং সন্তান-সন্ততির বিয়ের সময় কোষ্ঠী বিচারে প্রাধান্য দেন। এমনকী অনেক শিল্পী সাহিত্যিক, যাঁরা আধুনিকতম শিল্পতত্ত্ব নিজেদের সৃষ্টিতে প্রয়োগ করার কথা ভাবেন তাঁরাও পাড়ার মোড়ে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শনি মন্দিরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কপালে একবার হাত ঠেকিয়ে নেন; অত্যাধুনিক কারিগরি কৌশলে সমৃদ্ধ ঝাঁ-চকচকে বহুজাতিক সংস্থার ম্যানেজার, যার দু-চারটে বিলিতি ডিগ্রি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়, তিনিও বছরে একবার বাণিজ্যের দেবতাকে প্রসাদী ফুল দিয়ে থাকেন, আর, সমরাস্ত্র-প্রযুক্তির চুড়োয় ওঠা এই দেশে এখনও যুদ্ধজাহাজ সরকারিভাবে জলে ভাসানো হয় নারকেল ফাটিয়ে! তবে কি সেই শঙ্খ ঘোষের কবিতার মতো ভাবতে হবে, এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা! এই সমাজের মধ্যে আরেকটা প্রাগ-আধুনিক সমাজ!

বিশ্বাস করুন, এসব অপ্রিয় প্রসঙ্গের মধ্যে ব্যক্তি-আক্রমণের কোনও অজুহাত আদৌ নেই। এটা একটা সংকট, তীব্র তার সংক্রমণ। আধুনিক বিজ্ঞানের নিরন্তর গবেষণা ও সমৃদ্ধি যাবতীয় অন্ধ কু-প্রথাকে ভুল বলে প্রমাণিত করেছে, সমাজবিদ্যার প্রাগ্রসর চিন্তা মানুষের চেতনাকে পরিশোধিত করতে চেয়েছে স্তরে স্তরে। তাহলে এই শিক্ষা গবেষণা-চর্চার পরিসরে যাঁরা রয়েছেন কেন তাঁরা এই অগ্রগতির নির্যাসকে গ্রহণ করতে পারছেন না, বা গ্রহণ করলেও সেটা তাঁদের মনের উপরিতল থেকে অন্তরের গভীর প্রত্যয়ে প্রবাহিত হতে পারছে না? আর্থিক সমৃদ্ধি বা প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও সাহচর্য বদলে দিতে পারছে না অন্ধকার মানচিত্র? অনেকেই এসব প্রশ্নের একটা শর্টকাট জবাব হিসেবে এগুলোকে ব্যক্তিমনের বিশ্বাস হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিতে চান। তাতে কিন্তু মূল সংকটের কোনও নিরসন ঘটে না। কারণ, **ব্যক্তিমনের বিশ্বাস কোনও বিমূর্ত বা নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার নয়। ব্যক্তিমনের বিশ্বাস সমাজ-শরীরে সংক্রামিত হয়।** সমস্ত বিশ্বাসেরই তো একরকম পাল্টা যুক্তি আছে—সেগুলোর দুর্বলতাটা কোথায় যে তারা কেবল অন্ধতার কাছে পরাভূত হওয়াটাকেই তাদের অমোঘ নিয়তি বলে মেনে নেবে?

হয়তো বলা হবে হাজারো তত্ত্বের কথা। বলা হবে, ইউরোপীয় রেনেসাঁর কথা। ইতিহাসবিদরা প্রমাণ করতে নামবেন, ভারতবর্ষে সেই অর্থে কোনও শিল্পবিপ্লব কখনও ঘটেনি। ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটের সবচেয়ে উজ্জ্বল মুকুট রত্ন ভারতবর্ষে, উপনিবেশের শাসন বজা রাখার স্বার্থে ব্রিটিশরা কিছু সংস্কার করেছিলেন মাত্র। ভারতীয় রেনেসাঁ, আদপে যা বাংলা বা বলা ভালো শহর কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটা অংশের চেতনায় কিছু রং বদল ঘটিয়েছিল। এর মধ্যে সর্বজনীন আবেদনের কোনও বিষয় তেমন কিছু ছিল না। এসব তত্ত্বকে মাথায় রেখেই আরও দু-চারটে কথা বলি।

আমার কেবলই মনে হয় আমাদের চেনা সমাজটায় ধর্মীয়তা যেন একরকম হেড অফিসের বড়বাবুর ভূমিকা পালন করে আসছে সেই অনেককাল থেকেই। যার মনটা শান্ত হলেও মাথার ব্যামোটাকেও উপেক্ষা করা যাবে না। বাংলার মধ্যযুগে যে ধর্মনির্ভর সমাজ ছিল তারই ছাতার তলায় প্রশ্রয় পেয়েছে কুসংস্কার-কুপ্রথা কদাচারের নানান দৃষ্টান্ত, ঠিক যেভাবে ক্ষমতাসীন দাদাদের আশ্রয়ে ইদানিং জড়ো হয়ে থাকে নানারঙের প্রতিভাদৃপ্ত দুষ্কৃতীদের দল! উনিশ শতকের নবজাগরণ সেই ধর্মীয়তাকে সংস্কার করতে চেয়েছে কোথাও কোথাও সামাজিক সংস্কারও যে একদম হয়নি তা নয়, কিন্তু উপর থেকে নীচে চুঁইয়ে পড়ার তত্ত্ব (Downward filtration Theory) মেনে তা যে ব্যাপকতর মানুষের কাছে পৌঁছেছে, একথা বলা যায় না।

মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গোঁড়ামির প্রতিধর্মী যে সংস্কার প্রয়াস তারও সম্ভবত কোথাও স্থূলে ভুল ছিল। যে ব্রাহ্মধর্মকে সেই সময়ে প্রগতির অভিজ্ঞান বলে ধরা হয়েছিল তাতে মূর্তিপূজা, সতীপ্রথা বা অন্যান্য কুপ্রথার বিরোধিতা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের ঘেরাটোপ থেকে তা কি সর্ব অর্থে মুক্ত ছিল? একটা ছোট দৃষ্টান্ত এই সূত্রে বলা যেতে পারে। বাসন্তীদেবীর (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পত্নী) সন্ধে যখন তরুণ চিত্তরঞ্জনের বিবাহ স্থির হয় সেইসময় চিত্তরঞ্জন দাস তৎকালীন 'মালঞ্চ' পত্রিকায় কিছু কবিতা লিখেছিলেন যাতে ধর্ম ও ঈশ্বরতত্ত্ব বিরোধী কিছু বক্তব্য ছিল। এই অজুহাতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী বাসন্তী দেবীর পিতৃপরিবারের ওপর তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ চাপ সৃষ্টি করে বিবাহ বাতিল করতে চান। অবশেষে চিত্তরঞ্জনকে ব্রাহ্মসমাজের কাছে মুচলেকা দিতে হয় এই মর্মে যে তিনি নাস্তিক নন। তবে বিবাহের সম্মতি মেলে। এই ঘটনা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ঘটেছে। আজকের ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে এই দৃষ্টান্তের তফাত আছে কী?

বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতার বিবর্তনের সন্ধে আরেকটা যে জরুরি বিষয় জড়িয়ে আছে সেটা হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যাকে ইতিহাসের তাত্ত্বিকরা রেনেসাঁ-উত্তর নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের স্মারক বলে মনে করেন। কথাটা ফেলে দেওয়ার নয়, যে বাঙালি নেতৃত্ব ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা থেকে বিপ্লবী আন্দোলন পর্যন্ত

সবজায়গায় আমরা খুঁজে পেয়েছি আগুয়ান বাঙালিকে। এই সম্পৃক্তির মধ্যে নিখাদ ব্রিটিশ বিরোধিতা ছিল, অনুসরণযোগ্য ত্যাগ ও কৃচ্ছসাধন ছিল, কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্তির সাধনা বা সংস্কারের প্রাচীর ভাঙার, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের চর্চা কিন্তু সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ছিল না।

দুয়েকটা অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ টানতেই হয়। তার একটা হল, মূর্তিপুজোর মানসিকতার সঙ্গে মিলিয়ে দেশপ্রেমে এবং পৌত্তলিকতার একরকম সহজ যোগসূত্র তৈরি করা—যার সূত্রটা সম্ভবত অনেকটা উসকে দিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্'। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় নিতান্ত পাদপূরণের জন্য ছেপে দেওয়া একটি যথেষ্ট দুর্বল কবিতা এমন গুরুত্ব পেয়ে যাবে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও জানতে বা বুঝতে পারেননি। কিন্তু প্রশ্ন হল, দেশকে মাতৃমূর্তির সঙ্গে তুলনা করে 'বন্দেমাতরম্' বললে দেশপ্রেমের আবেগ হয়তো সংহত হয় কিন্তু এটা কি খুব মুক্তমতির পরিচর্যা করে? পাশাপাশি স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে ওঠা কিছু বাংলাগানের দৃষ্টান্তও একটু তলিয়ে দেখা যেতে পারে। ধরা যাক, 'উঠো গো ভারতলক্ষ্মী' বা 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' এইসব গানগুলির কথা। খুব নির্দিষ্টভাবে এসব গানে দেশকে তুলনা করা হচ্ছে মাতৃরূপ দেবীর সঙ্গে, যা আসলে আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণের সামাজিক পরিস্থিতিটার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তা-ই 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'-এর মতো আহ্বান সকলের কাছে গ্রাহ্য হয়ে ওঠে, কারণ পরাধীন দেশের সঙ্গে 'দীন দুখিনি মা'-এর একটা স্বাভাবিক প্রতিস্থাপন ঘটে বাঙালির মনে। এরই পাশে 'ধরমেতে ধীর' বা 'করমেতে বীর' হয়ে ওঠার প্রত্যাশায় যখন কবির কলম আস্থা রাখে, তিনি জানিয়ে দিতে ভোলেন না 'সাথে আছে ভগবান নাহি ভয়'! মনে করে নিন 'বল বল সবে/শতবীণা বেণু রবে' গানের কথা যেখানে একইসঙ্গে 'ধর্মে মহান' হওয়ার কথাও বলা হচ্ছে! মাতৃরূপী দেশবন্দনার ঝুঁকির দিকে রবীন্দ্রনাথ বারবার ইঙ্গিত করেছেন তাঁর অজস্র রচনায়। তাঁর গান একটা অন্য জগতের নির্মাণ ঘটায় আমাদের মননে, কিন্তু একটু ঝুঁকি নিয়েই বলি, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের উত্তেজক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তিনি কিন্তু 'বাংলার মাটি বাংলার জল'-কে পুণ্য করে তোলার প্রার্থনা রাখেন 'ভগবান'-এরই কাছে! এই ঈশ্বর রবীন্দ্রগানের সেই 'ভক্তপ্রাণের প্রেমে' নেমে আসা ঈশ্বর নন যাঁকে 'সবার পিছে, সবার নীচে সবহারাদের মাঝে' খুঁজে পাওয়া যায়, যাকে ছুঁতে গেলে ঈশ্বর তত্ত্বে ঘোর অবিশ্বাসীরও কোনও ভক্তিবাদের বর্ম পরার প্রয়োজন হয় না।

এবার আমরা চোখ রাখি অন্য একটা গানের দৃষ্টান্তে। ক্ষুদিরামের গৌরবময় আত্মোৎসর্গের পটভূমিতে রচিত 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানের সঙ্গে যে জন্মান্তরবাদের সরাসরি যোগসূত্র তৈরি হয়ে যায়, আমরা কখনও কি সেটা খেয়াল করে দেখেছি? হয়তো দেখতে চাই না, কারণ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে এমন

একটা অবৈজ্ঞানিক ধারণাকে আমরা মনে মনে লালন করি। কার্যত বাঙালির স্বাদেশিকতাবোধের বিস্তারের সঙ্গে যুক্তিবাদী মননের একটা সংঘাত যেন বারবারই প্রকট হয়ে উঠতে চায়। নতুবা বাংলার বিপ্লব-আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ বিপ্লবী বাঘা যতীন কেন আলিপুর জেল থেকে তাঁর দিদিকে পাঠানো এক চিঠিতে লিখবেন '... আমি এক্ষণে সুস্থ হইয়াছি, তবে অসুখটা একটু বেশি হইয়াছিল তাই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম আবার শ্রীগুরুর কৃপায় আস্তে আস্তে সবল হইতেছি। যাহা হউক, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই চরণে আমাকে নিবেদন করিয়া রাখুন' ইত্যাদি।

আরেক মহান বিপ্লবী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কিংবদন্তী নায়ক সূর্য সেন জেলের কনডেম্‌ড সেলে বসে ফাঁসির আগে তাঁর বউদিকে লিখছেন : 'এবারের চলা শেষ হল। যদি আবার ভগবানের ইচ্ছায় এপারে আসতে পারি...' বুঝতে অসুবিধা হয় না এসব বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস জড়িয়ে আছে যার অন্তর্গত হয়ে রয়েছে পরজন্ম, অদৃষ্টনির্ভরতা সব কিছুই। দেশের পরাধীনতার শেকল ছেঁড়ার ব্রতে হাতে অস্ত্র তুলে নিলেন যাঁরা, তাঁরা সংস্কার আর ভ্রান্ত গোঁড়ামির শৃঙ্খলকে উপেক্ষা করেই গেলেন তাহলে? ভাববার কথা, ব্যক্তিবিশ্বাসের মধ্যে এমন সব পিছিয়ে পড়া ধারণার বিস্তার তাঁদের রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে কোনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।—রাজনীতি ও সমাজবিদ্যার আগ্রহী গবেষকরা এই কৌতূহলপ্রদ তথ্যটি খেয়াল করে দেখতে পারেন। এই সমস্ত প্রবণতার ধারাবাহিকতায় যখন অবিসংবাদী জননেতা হিসেবে মহাত্মা গান্ধী বিহারের ভূমিকম্পকে 'ঈশ্বরের অভিশাপ' হিসেবে চিহ্নিত করেন তখন আবার সেই পুরনো জিজ্ঞাসাটাই পথ জুড়ে দাঁড়ায়—**বাংলা তথা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কি আদৌ কখনও সার্বিক সামাজিক আন্দোলনের হাত ধরে এগোতে চেয়েছে? না কি রাজনৈতিক সুবিধালাভের স্বার্থে কেবলই তামসিকতার সঙ্গে আপোষ করে গেছে? প্রশ্ন ওঠে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা কি সকলেই ব্যক্তি-জীবনে মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন? যদি এমন ঘটত তাহলে ভারতবর্ষের ইতিহাসটা অন্যরকমভাবে লেখা হত।**

মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, স্বাধীনোত্তর ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে সেই পুরনো ট্রাডিশনেরই পুনরাবৃত্তি। দিস্তে দিস্তে পরিকল্পনায় দেশের শিল্প-কৃষি-বিজ্ঞান গবেষণা তরতর করে এগিয়েছে, প্রযুক্তির আধুনিকতম উপাদান আমরা আমদানি করে এনেছি, শিল্প-বিনিয়োগ বা কৃষিক্ষেত্রের সবুজ বিপ্লবে দেশটা আর যাই হোক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। আমরা পরমাণু শক্তিকে আয়ত্তে এনেছি, যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে প্রতিবেশী দেশগুলিকে বোকা বানিয়ে এগিয়ে গেছি, আধুনিক কম্পিউটার প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে প্রযুক্তিগবেষণার পথ সুগম করেছি। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান বিচারপতি, বৈজ্ঞানিক, আমলা, রাজনীতির তাবড় তাবড় নেতা-নেত্রীরা সকলে কেউ গুরুজির আশীর্বাদ ধন্য, কেউ বৃক্ষাশ্রয়ী বাবার পদধূলি বা পদাঘাত না খেয়ে শুভ

কাজে আগুয়ান হন না, কেউবা সরকারি অর্থে তীর্থদর্শনে যান, কেউ সংবিধানকে কলা দেখিয়ে বিশেষ কোনও ধর্মের হয়ে সাফাই গেয়ে বেড়ান, কেউ জ্যোতিষগণনা-নির্ধারিত সময়ে শপথ নিয়ে জনসেবায় বা ভোট প্রচারে নামেন, কেউ পুজোর বেদির তলায় টাকা পুঁতে রাখেন, কেউ আবার সুযোগ পেলেই পুনর্জন্ম বা পরজন্ম নিয়ে ভাষণ দেন, হয়তো মনে মনে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন, অশুভশক্তিকে তাড়ানোর জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করেন, মন্দিরে মসজিদে-মাজারে উপঢৌকন দেন, উঠতি 'গুরু'দের তোল্লাই দেন ইত্যাদি ইত্যাদি—এই দীর্ঘতালিকা কোথায় শেষ হবে বলা মুশকিল!

তার মানে, আবার সেই চেনা দেশের মধ্যে থেকে যাওয়া অন্য এক দেশের ছবি। কলকাতার মধ্যে অন্য এক কলকাতার লুকিয়ে থাকা যার মধ্যে কোনও নাগরিক মননশীলতা অনুপস্থিত। তাই যে হাত মোবাইল ফোন ধরে থাকে সেই হাতেই বাঁধা মাদুলি কবচ নিদেনপক্ষে বিপত্তারিণীর একগোছা সুতো—কী আশ্চর্য, তারও রং লাল! বহুজাতিক সংস্থার হঠাৎ উধাও ম্যানেজিং ডিরেক্টর যখন বাড়ি ফিরে বাড়ির লনে পারিবারিক গুরুর ছবি টাঙিয়ে কীর্তনের আসর বসান তখন আবার আমাদের মনে পড়ে যায় ত্রৈলোক্যনাথ কথিত সেই অন্ধকারের কথা। থাকলই বা উচ্চশিক্ষা, উচ্চতম চাকুরি, বিলিতি ডিগ্রি, সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বহুমূল্য ঝাড়লণ্ঠন—অন্ধকার, সে তো শুধুই অন্ধকার!

এঁরা সেই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণির প্রতিনিধি, যাঁরা সেই উনিশ শতক থেকে চেতনাহীন শিক্ষার মধ্যে প্রতিফলিত, সামাজিক সংস্কারহীন এক রাজনৈতিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক, পিছুটানা অন্ধতা আর পরিকল্পিত প্রগতির বিকলাঙ্গ সন্ততি। সমস্যা হল, এই মানুষগুলিই ভোটে দাঁড়ান, রাজনীতির মিছিলে পুরোভাগে থাকেন, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান, সরকারি চাকরি করেন, বইমেলা থেকে পাড়ার পুজো কমিটির কর্তা হয়ে বসেন, সাহিত্যচর্চা করেন, পত্রিকা প্রকাশ করেন, সিনেমা-নাটক তৈরি করেন, কাগজে চিঠি লেখেন। ফলে যে ঘোর-লাগা অন্ধকার তাঁদের মনের কোণে বাসা বেঁধে থাকে তার কোনও আলোকিত প্রতিপক্ষ সংহত হতে পারে না। এ ব্যাপারে গ্রাম বা শহরকে আলাদা গোত্রে ফেলার কোনও মানে হয় না।

তবে কি সব মিলিয়ে এক ভঙ্গিসর্বস্ব আধুনিকতার মধ্যেই আমাদের বসবাস? হয়তো তাই। আমাদের এই রাজ্যেও তো গত দশকগুলির মধ্যবর্তিতায় ডান-বাম রাজনীতির ভোট নিতান্ত কম বাড়েনি, রাজনৈতিক দলের রমরমা বেড়েছে কয়েকগুণ, সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা বা চর্চার ঘনঘটাও কিছু কম নয় কিন্তু সংখ্যালঘু এক জনগোষ্ঠী পেরিয়ে চেতনার খরশান দীপ্তি কি পৌঁছেছে বেশিরভাগ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অন্দরমহলে?

উৎসাহী গবেষকরা এ প্রশ্নের যোগ্য জবাব খুঁজতে থাকুন। আসুন, সেই অবসরে আমরা ওই দুই সহ-নাগরিক ট্রেনযাত্রীর কাছে থেকে আরও দুটো ভূতের গপ্পো শুনে নিই!

আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পদ্ধতি ও ভারত

সুতীর্থ সিংহ

বিশ্বের ইতিহাসে অতি সম্প্রতি একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল। আমেরিকায় সি CIVIL RIGHTS ACT (1989) এর ৪৪ বছর পর ২০০৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেন বারাক হুসেন ওবামা। তিনি হলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৫৬ তম রাষ্ট্রপতি। তিনি এখন ইলিনয় প্রদেশের সেনেটর।

এই সুযোগে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিটি জেনে নিলে ভালো হয়। মার্কিন কংগ্রেসের রয়েছে দু'টি কক্ষ। একটি সেনেট এবং অন্যটি 'House of Representatives' বা প্রতিনিধিসভা। আয়তন এবং জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রত্যেক রাজ্যে থাকেন দুইজন সেনেটর। প্রতিনিধিসভার ক্ষেত্রে প্রথমে প্রতিনিধিসভার সভ্যসংখ্যা নির্ধারণ করা হয় এবং তা প্রতিটি রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি রাজ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রতিটি রাজ্যে যতজন প্রতিনিধি মার্কিন কংগ্রেসে থাকেন (অর্থাৎ দুইজন সেনেটর ও প্রতিনিধিসভার সদস্য) ততসংখ্যক ব্যক্তিকে নিয়ে কোনো রাজ্য থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য একটি নির্বাচকমণ্ডলী তৈরি করা হয়, যাকে বলা হয় 'Electoral College'। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরাই ভোট দিয়ে নির্বাচন করেন দেশের রাষ্ট্রপতিকে। এই নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন করে আমেরিকার জনগণ।

কোনও দলের হয়ে কে রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, সেটা নির্বাচনেরও একটা বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণভাবে মূল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগের গ্রীষ্মে প্রতিটি রাজনৈতিক দল একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলন মঞ্চ থেকেই ঘোষণা করা হয় ওই দলের সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নাম। যেমন—এবার ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সম্মেলন থেকে উঠে এসেছিল বারাক ওবামা ও হিলারি ক্লিন্টনের নাম। এবার বিভিন্ন জায়গায় দলের সমর্থকদের নিয়ে একটি সভা হয়। এই সভাগুলিকে বলা হয় ককাস (Caucus)। এই ককাসগুলি থেকেই দলের সমর্থকরা চূড়ান্ত নির্বাচনে তাদের দলের প্রার্থীকে মনোনীত করেন। যেমন— বারাক ওবামা এবং হিলারি ক্লিন্টন-এর মধ্যে ডেমোক্র্যাট সমর্থকরা বিভিন্ন ককাস থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসাবে ওবামাকে মনোনীত করেন।

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ও শক্তিশালী গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত ও সময়সাপেক্ষ।

এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি আমাদের দেশের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের সঙ্গে আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের একটি তুলনা না টানা যায়।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে আমাদের দেশ চালনার প্রধান ক্ষমতা যেমন প্রধানমন্ত্রীর, তেমনই আমেরিকায় রাষ্ট্রপরিচালনার ভার রয়েছে প্রেসিডেন্টের হাতে। অর্থাৎ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আমাদের প্রধানমন্ত্রী।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টই হলেন সমস্ত ক্ষেত্রে Decision Maker। তিনি সাহায্য নেন তাঁর মনোনীত একটি টিমের। যাতে থাকেন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বিজ্ঞান বিষয়ক উপদেষ্টা, নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা ইত্যাদি। ভারতের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীই সবথেকে ক্ষমতাবান, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মতো কোনও টিম থাকে না, থাকে একটি মন্ত্রীসভা। এই মন্ত্রীসভায় থাকে অর্থমন্ত্রী, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইত্যাদি। এই মন্ত্রীসভার কাজকর্ম সুপারভিশন করেন এবং কোনো নির্দেশ দেওয়ার থাকলে দেন প্রধানমন্ত্রী। এই মন্ত্রীরা সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সাংসদ। উপরের কথাগুলি শুনতে ভালো লাগলেও আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী Decision Maker নন। তিনি নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, তিনি চলেন পার্টির কথা শুনে। কোনো সিদ্ধান্ত নিলেও তা নেয় মন্ত্রীসভা, এটাই সাধারণ নিয়ম। তারপরও থাকে কোয়ালিশনের অন্তর্ভুক্ত দলগুলোর মন রাখার চেষ্টা।

এর আগে বিজেপি সরকার চলত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর মতো সাম্প্রদায়িক সংগঠনের কথা মাথায় রেখে এবং সহযোগিতা নিয়ে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মূলত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দু'টি দল—রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। সেখানে ভারতে প্রধান দু'টি দল বিজেপি ও কংগ্রেস ছাড়াও লোকসভা ও রাজ্যসভায় বহু আঞ্চলিক দলের প্রতিনিধিরা থাকেন। রাজনৈতিক দলের মোটসংখ্যা ১২৫ এর বেশি। অর্থাৎ ভারতে রয়েছে Multi Party Democracy বা বহুদলীয় গণতন্ত্র। **ভারতে একগাদা দল মিলে কোয়ালিশন সরকার গঠন করে। নানা বিপরীত চিন্তার দল এই কোয়ালিশনে থাকে। এইসব দলের কাজ প্রধানত প্রধানমন্ত্রীকে ব্ল্যাকমেল করে নিজের ও তারপর দলের স্বার্থ চরিতার্থ করা। প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কাজ, দেশের স্বার্থরক্ষার চেয়ে কোয়ালিশনভুক্ত দলগুলোর কাজিয়া মিটিয়ে গদি রক্ষা করা।**

যে-কোনো নির্বাচনে লড়তে গেলেই প্রয়োজন অর্থের, এটি অনস্বীকার্য। কিন্তু, আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে এক্ষেত্রেও রয়েছে পার্থক্য। পার্থক্য হচ্ছে স্বচ্ছতার।

আমেরিকায় কোনো দল নির্বাচনের জন্য কত অর্থ তুলছে এবং কীভাবে কত খরচ করছে তার একটা পরিষ্কার হিসাব থাকে (প্রসঙ্গত, এইভাবেই সারা পালিনের পোশাকের মূল্য একটা চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছিল)।

ভারতের ক্ষেত্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এবং জিততে গেলে লাগে প্রচুর অর্থ এবং বড় একটা ব্যবসায়ী লবির জোর। আরও একটি জিনিস ভারতের রাজনীতি এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল—পরিবারতন্ত্র। অতি সম্প্রতি কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদিকা মার্গারেট আলভা অভিযোগ করেন, কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে পার্টির টিকিট বিক্রি করা হয়েছিল। কথাগুলি এমন নয় যে, ঘটনাটা প্রথম ঘটেছে এবং বিচ্ছিন্ন কিছু। আলভাও অভিযোগটি করেন নিজের ছেলে নিবেদিত-এর জন্য টিকিট চেয়ে প্রত্যাখাত হওয়ার পর। আসলে, ভারতে পরিবারতন্ত্রটাই নির্বাচনী প্রথা। টাকা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই কিনতে হয় পার্টির হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার টিকিট। অবশ্য যারা এই টিকিট কেনেন লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি টাকার বিনিময়ে তারা বোকা নন। নির্বাচনে জিততে পারলে রয়েছে বেআইনিভাবে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ—সেটা সংসদে প্রশ্ন তোলা থেকে কোনও বিশেষ সুবিধা কাউকে পাইয়ে দেওয়া যাই-ই হোক না কেন।

তবে, লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়ে পার্টির টিকিট কিনলেই যে কেউ জিতবেন তার তো কোনও মানে নেই, হারতেও পারেন। এক্ষেত্রে বলা ভালো—এটা একটা ফাটকা ব্যবসার মতো, প্রচুর টাকা ইনভেস্ট করে জিততে পারলে আগামী পাঁচ বা ছয় বছরে (রাজ্যসভার ক্ষেত্রে) দ্বিগুণের বেশি টাকা উশুল করে নেন প্রার্থীরা। আর হারলে?— ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি তো আছেই।

আমেরিকায় প্রার্থীরা জেতার জন্য ব্যাপক প্রচার চালান। ভারতেও প্রচার বেশ ভালোই চালানো হয়। তবে জেতার জন্য শুধুমাত্র ভোটারদের উপর ভরসা না রেখে দলগুলি ভোটের আগে জাল ভোটার তালিকা তৈরি করে। ভোটের দিন চলে রিগিং, বুথ জ্যাম, ছাপ্পা ভোট, বল প্রয়োগ। জেতে সেই যার ক্ষমতা যত বেশি। বলা যায়—'জিসকা ডান্ডা উসকা ভৈঁষ'।

আরও একটি বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়ার। আমেরিকায় কোন দলের হয়ে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, তার জন্য দল থেকে একাধিক প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয় এবং বিভিন্ন 'ককাস' থেকে দলের সমর্থকরা তাঁদের দলের চূড়ান্ত প্রার্থীকে নির্বাচন করেন। ভারতের ক্ষেত্রে কোনও দলের সমর্থকরা তাঁদের দলের হয়ে কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তা ঠিক করতে পারেন না। এটি ঠিক হয় অর্থ, লবি এবং পরিবারতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে, যা আগেই বলা হয়েছে।

এসব দেখে আমরা বলতে পারি "ভারত সবথেকে বড় 'অগণতান্ত্রিক' দেশ।"

যাত্রা নিয়ে দু-চার কথা

সুদীপ চক্রবর্তী

"যাত্রা" বাংলার এক সুপ্রাচীন লোকসংস্কৃতি, সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে এগিয়ে চলেছে যাত্রা। 'যাত্রা দ্যাখে ফাতরা লোকে' এই প্রবাদ আজ মিথ্যে প্রমাণিত।

১৮৮২ সালে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় লন্ডনের-জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. পান যাত্রার উপর গবেষণা করে।

* ১৯৭০ সালে 'লেনিন' যাত্রাপালা সোভিয়েত রাশিয়া থেকে পুরস্কৃত হয়।

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় যাত্রামঞ্চ ও যাত্রা আকাদেমি তৈরি হয়েছে, যাত্রা আকাদেমি পত্রিকা বের হচ্ছে, প্রতি বছর যাত্রা উৎসব হচ্ছে।

* মুম্বাই, বাংলাদেশ ও টালিগঞ্জের সিনেমার শিল্পীরা ছুটে আসছে যাত্রায়। আগের চেয়ে অ-নে-ক বেশি টাকা লগ্নী হচ্ছে যাত্রায়।

* যাত্রা এক শক্তিশালী গণমাধ্যম, যাত্রা স্বনির্ভর। যাত্রা বিজ্ঞাপন নির্ভর নয় বলেই আজও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে যাত্রার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এক সময় শুধু ধর্মীয় অনুষঙ্গ ছুঁয়েই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যাত্রাপালা পরিবেশিত হত, যেমন দক্ষিণ ভারতে 'জেঠ যাত্রা' ওড়িশায় 'গুঞ্চিতা যাত্রা' নেপালের 'ভৈরব যাত্রা', 'ইন্দ্র যাত্রা' প্রভৃতি। (যাত্রা শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ-প্রস্থান বা গমন।)

সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে, ধর্মীয় বা সামাজিক উৎসব উপলক্ষে পালাগান বা কাহিনি-বর্ণনার অভিনয় "যাত্রা" বলে পরিচিতি পেতে শুরু করে। গ্রামবাংলায় একসময় যাত্রাই ছিল বিনোদনের প্রধান উৎস। কোথাও যাত্রার আসর হলে দূর-দূর থেকে হাজার হাজার লোক যাত্রা শুনতে যেত।

বাংলার শিল্পসাহিত্যে প্রথম সারিতে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে কোনও না-কোনওভাবে যাত্রার যোগ ছিল বা আছে। কাজী নজরুল ইসলাম লেটো যাত্রাদলে অভিনয় করতেন। শৌখিন দলে উত্তম কুমার, রবীন্দ্রনাথ এমনকী অমর্ত্য সেনের নামও পাওয়া যায়।

যাত্রায় মহিলা চরিত্রে আগে পুরুষরাই অভিনয় করত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন ঘটেছে—ক্ষিতীশরানি, ছবিরানিদের জায়গায় এসেছে জ্যোৎস্না দত্ত, বীনা দাশগুপ্ত-রা। বর্তমানে একটি যাত্রাপালার সময়সীমা তিন ঘণ্টার মধ্যে বাঁধা থাকে। এটাই আগে হত ছয়, সাত ঘণ্টা ধরে। যাত্রার আসরে হ্যাজাক লাইটের পরিবর্তে

এসেছে অত্যাধুনিক লাইটিং ব্যবস্থা ও আধুনিক মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা। আগে মাইক ছাড়া খালি গলায় যাত্রার সংলাপ বলতে হত।

যাত্রায় প্রথমদিকে পৌরাণিক কাহিনি নিয়েই পালা তৈরি হত। পরবর্তী পর্যায়ে ঐতিহাসিক কাহিনি স্থান করে নেয়। আস্তে আস্তে বিদেশি কাহিনিও ঢুকতে শুরু করে। বর্তমানে সামাজিক কাহিনি নিয়েই সাধারণত পালা রচনা হয়। সামাজিক পালায় ফুটে ওঠে সমাজের শোষণ, ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িকতা, নারীনির্যাতন, কু-সংস্কার, বর্ণবৈষম্য, এ সময়ের দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রভৃতি।

পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে—বাংলার যাত্রাশিল্প ছিল একটা হাতিয়ার। চারণকবি মুকুন্দ দাসের গানেই তার ছবি ফুটে ওঠে।

যাত্রা-নাটক যে তৎকালীন সরকারের পথে কাঁটা তৈরি করেছিল, সেটা বোঝা যায় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারের "নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন" জারি করার তথ্য থেকে।

আমাদের সমাজের কিছু অতি বুদ্ধিমান সম্প্রদায় এক সময় যাত্রাকে ফালতু বা গাঁইয়া সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে উপেক্ষা করে গেছে। আবার চৈতন্যদেব থেকে মুকুন্দ দাসের মতো অসংখ্য গুণীলোকেরা এই যাত্রাকেই কাজে লাগিয়েছেন তাঁদের আন্দোলনের প্রয়োজনে। বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথকে প্রতি মুহূর্তে প্রশস্ত করেছে এবং করে চলেছে যাত্রা। একথা ভুললে চলবে না যে কলকাতায় কোনও নাটকের দল এখনও সারা বছর ধরে হলে শো করে যে দর্শক পায়, একটা বড় যাত্রা দলের, একটা শোয়ে সেই দর্শক হয়।

কলকাতায় বর্তমানে ৪০/৪৫ টির মতো পেশাদারী যাত্রাদল আছে। এছাড়া প্রত্যেক জেলাস্তরে বেশকিছু দল আছে, বিশেষ করে মেদিনীপুরে। একটা দলে ৫০ জনের মতো লোক থাকে, তার মধ্যে ১৫/১৬ জনের মতো শিল্পী। বাকিরা কেউ বাজনার দায়িত্বে, কেউ লাইট, মাইক, কেউ ম্যানেজার ও তার সহকারীবৃন্দ। প্রযোজকের **যেহেতু প্রচুর টাকা ব্যয় হয় পালা তৈরি করতে, তাই টাকা ফেরত ও লাভের ব্যাপার চিন্তা করে ব্যবসার স্বার্থে—ধর্মীয় আচার, মাত্রাতিরিক্ত আবেগ ও কুসংস্কারকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঐতিহ্য বলে চালিয়ে সস্তায় বাজিমাৎ করার প্রবণতা যাত্রায় দীর্ঘদিনের। আবার ব্যতিক্রমী কিছু পালাকার ঠিক উল্টো পথটাই বেছে নেয় বা পূর্বে নিয়েওছেন। হয়তো নৈতিক দায়িত্ব থেকেই সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ব্রজেন্দ্রকুমার দে, ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়, শম্ভু বাগ, উৎপল দত্ত, উৎপল রায়-সহ অনেকেই।**

ব্রজেন্দ্রকুমার দে তার বেশিরভাগ পালায়—জাতপাত, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, নারী দলন, আদিবাসী নিপীড়ন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কথা তুলে ধরেছেন। ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় তার প্রথম জীবনের পালাগুলির মধ্যে সর্বহারার সংগ্রামকে তুলে ধরছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। শম্ভু বাগ তার পালায় লেনিন, কার্লমার্কস, ম্যান্ডেলা, হিটলারের মতো চরিত্র নিয়ে পালা লিখেছেন। ১৯৭০ সালে

লেনিন জন্মশতবর্ষে সোভিয়েত রাশিয়ায় নেহেরু পুরস্কার পায় লেনিন যাত্রাপালা। অভিনেতা শান্তিগোপাল আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন সোভিয়েত দেশ ভ্রমণের। পালাকার শম্ভু বাগের ছবি-সহ সোভিয়েতে পত্রপত্রিকায় সাক্ষাৎকার ছাপা হয়।

উৎপল দত্ত যাত্রায় ২০ টির মতো পালা লিখেছেন। "রাইফেল" থেকে শুরু করে "দামামা ওই বাজে"—প্রত্যেকটি পালাই অমূল্য সম্পদ। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি, উৎপল দত্তের পালায়। বাংলার সাংস্কৃতি বিপ্লব যেভাবে ফুটে উঠেছে সেটা অন্য কারও পালায় ফুটে ওঠেনি। লেনিন পালায় রেকর্ডের কভারে কৃষক নেতা হরেকৃষ্ণ কোঙারের মন্তব্য ছাপা হয়েছিল— "হাজার হাজার রাজনৈতিক বক্তৃতার মাধ্যমে আমরা দেশের সাধারণ মানুষকে যতটুকু সচেতন করেছি তারচেয়ে হাজার গুণ বেশি করেছে লেনিন যাত্রাপালা"। হরেকৃষ্ণ কোঙারের মতোই উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ প্রবীর ঘোষ—"নিশুতি রাতে হায়নার কান্না" যাত্রাপালাটি দেখে (১৬ এপ্রিল ০৭—"যাত্রামঞ্চে")। পালাকার উৎপল রায়, নির্দেশনা ও প্রধান ভূমিকায় ছিলেন ত্রিদিব ঘোষ। উৎপল রায় বর্তমানের সেরা পালাকার, তার লেখায় সব সময় সুস্থ সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল ভাবনা লক্ষ করা যায়। তাঁর নিশুতি রাতে হায়নার কান্না—পালার জন্য ১ মার্চ ২০০৮ যুক্তিবাদী দিবসে বর্ষসেরা লেখকের পুরস্কার দিয়েছে যুক্তিবাদী সমিতি। পালাটির বিষয় ছিল ভণ্ডবাবাজীর বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের লড়াই।

১৮৮২ সালে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় লন্ডনের জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের দেশের লোকনাট্য নিয়ে এক গবেষণাপত্র দাখিল করেন (The Yatras : Popular Dramas of Bengal) এই গবেষণাপত্র উচ্চ প্রশংসিত হয়ে জুরিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ.ডি. উপাধি পান নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

যাত্রায় অভিনয় করার জন্য হিন্দি সিনেমা থেকে এসেছেন—শক্তি কাপুর, রঞ্জিত, জিনাত আমান, জয়াপ্রদা, আসরানি, সুধাচন্দ্রন-সহ অনেকে, আর বাংলার তো কেউই বাকি নেই।

সিনেমার শিল্পীরা পাঁচ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত রোজ পান আর যাত্রাশিল্পীরা একশো টাকা থেকে পনেরো হাজার টাকা পর্যন্ত রোজ পান।

যাত্রায় সবকিছুর উন্নতি হয়েছে কিন্তু সাধারণ শিল্পী ও কলাকুশলীদের উন্নতি হয়নি। এটাই একমাত্র দুঃখজনক যাত্রাপালায় সর্বহারা জনগণের সংগ্রামের—"আওয়াজ" গ্রাম থেকে শহর তোলপাড় করে মহাকরণ পর্যন্ত পৌঁছালেও—চিৎপুর যাত্রাপাড়ার গদিঘরে বোধ হয় পৌঁছায়নি। আগের চেয়ে অনেক বেশি টাকা যাত্রায় লগ্নী হচ্ছে। নিশ্চয়ই ব্যবসা হচ্ছে তাই প্রযোজকরা লগ্নী করছেন। এই সাফল্যের প্রভাব আমরা লক্ষ করছি শুধুমাত্র প্রযোজক ও প্রধান শিল্পীদের মধ্যে।

এই বৈষম্যের পরিবর্তন না ঘটলে যাত্রার সত্যিকারের আধুনিকীকরণ ও ঐতিহ্য বোধহয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ ব্যাপারে প্রযোজক, যাত্রা আকাদেমি এবং প্রধান শিল্পীদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

অপরাধী কে? চিনে নিন।

মানসী

সত্যজিতের ফেলুদা, শার্লকহোমস্, কিরীটি অমনিবাস পুরো কৈশোরটা জমিয়ে রেখেছিল বেশ। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় ছুটতে ছুটতে একদিন পৌঁছে গেলাম যুক্তিবাদী সমিতিতে। যুক্তিবাদী সমিতি কোনও গোয়েন্দা তৈরি করে না। সমিতির প্রতিটি স্টাডিক্লাসে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা, যুক্তি-বুদ্ধিকে অনেক ধারালো করে। আর সেই মেধার ওপর ভরসা করেই মাঝে মাঝে নেমে পড়ি তদন্ত করতে।

যুক্তিবাদীদের পোড়া সিগারেটের টুকরো বা রক্তের দাগ বা জামার বোতাম খোঁজার প্রয়োজন হয় না। আমাদের প্রধান ভরসা বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনো, সঠিক বিশ্লেষণী ক্ষমতা, নিরপেক্ষতা, সততা। এই তথ্যগুলো নিয়েই একের পর এক অপরাধের তদন্ত করেছি। খুন, আত্মহত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, বোমা বিস্ফোরণ—প্রতিটি ঘটনার মূল অপরাধী কে বা কারা হতে পারে তার একটা হদিস দিয়ে ফেলি। সবটাই একটা ক্যালকুলেশন। কীভাবে? আসুন তবে একটু শিখে নিই। অপরাধ নানা ধরনের হতে পারে।

১) ব্যক্তিগত ২) দলগত ৩) রাজনৈতিক কারণে ইত্যাদি যে-কোনও অপরাধ বিশ্লেষণ করতে হলে সবচেয়ে আগে বুঝতে হয়—তাই ঘটনা ঘটার জন্য কার বা কাদের সবচেয়ে বেশি লাভ হতে পারে? এই ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলেই তদন্তটা একধাপ এগোলো।

আরও এগোতে হলে তারও একটি পদ্ধতি আছে। ধরা গেল কেউ খুন হয়েছে। খুনী কে? খুব জানতে ইচ্ছে করছে। প্রাথমিক কতগুলো বিষয় জেনে নেওয়া জরুরি।

১) যে খুন হয়েছে তার নাম, বয়স।

২) দেখতে কেমন অর্থাৎ সুন্দর ছেলে বা মেয়ে হলে চেহারাটা খুনের একটা পরোক্ষ কারণ হতেই পারে। প্রেম, ত্রিকোণ প্রেম, লালসা ইত্যাদি কারণ বেরিয়ে আসতে পারে।

৩) পড়াশুনো কতদূর? উচ্চমেধা না মধ্যমেধা না স্কুলের গণ্ডিও পেরোয়নি। কী নিয়ে পড়াশুনো? কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ? সাইবার ক্রাইম করার সম্ভাবনা কতটা?

৪) বন্ধু সারকেল কীরকম? একজন মধ্যবয়স্ক চাটার্ড অ্যাকাউনটেন্টের যদি ১৫০০

টাকা মাস মাইনের সুদর্শন ছেলে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়, তবে হোমো হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৫) পেশা কী?

৬) জাতি বা ধর্ম কী?

৭) কীরকম পরিবেশে থাকে? ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর কেন জোর দেব, তা একটু বিশ্লেষণ দরকার।

* নাম, বয়স, অনুসন্ধানের একদম প্রাথমিক বিষয়।

*** চেহারা একটা ফ্যাক্টর :**

দেখতে সুন্দর মেয়ে হলে প্রেমঘটিত কারণ অনুমান করা যায়। অনেক সময় রূপ দেখিয়ে সুবিধা নিতে গিয়ে বিপদ ডেকে আনতে পারে। ভালো দেখতে সুপুরুষ, তার সাথে ভালো কথা বলতে পারলে, অনেক সময়ই দেখা গেছে তারা অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। বহুজনের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। পরিণতিতে খুন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তবে সব সুন্দরী মহিলা বা পুরুষ এমনটাই চরিত্রের হবে এমনটা কখনো ভাববেন না। চরিত্র তরলমতি কিনা সেটা বুঝতে হয় তার অ্যাটিট্যুড দেখেই।

*** পড়াশুনো কতদূর তা জীবনযাত্রার মান বুঝতে সাহায্য করে :**

যদি কেউ স্কুল পাশ না করে থাকে, তবে পেশার স্বার্থে দুর্নীতিগ্রস্থ, বে-আইনি কার্যকলাপে জড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সে শিক্ষিত লোকের কাছে পাত্তা পায় না। ফলে নিম্নশ্রেণির লোকেদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

পড়াশুনোর মান কম বলে ভালো, সম্মানযোগ্য কর্মসংস্থান পায় না। অথচ আয় করতে চায় অনেক। তখনই ছোট্টখাট্ট অপরাধ দিয়ে হাতে খড়ি হয়। সে পকেটমার হতে পারে, চোরাকারবারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, নিষিদ্ধ জিনিস পাচার করতে পারে, বেশ্যার দালালি থেকে চোলাই মদ বিক্রিকে পেশা করতে পারে। অর্থের লোভ আর শিক্ষার ঘাটতি দুটো মিলে একটা খারাপ দিকে নিয়ে যেতে থাকে মানুষটাকে।

এদের অনেকেরই সৎ ভাবে রিক্সা চালিয়ে, হকারি করে, সবজি বিক্রি করে বা চায়ের দোকান চালিয়ে সংসার চালাতে সম্মানবোধে আঘাত করে। এই মিথ্যে আত্মসম্মানের মুখোশটাই সবচেয়ে ভয়ংকর অপরাধ করে চলে। খুন হয় বেআইনি এলাকা দখলের লড়াইতে, তোলা আদায় করতে গিয়ে। অস্ত্র পাচার করার সময় এনকাউন্টারে।

*** 'বন্ধু' গ্রুপ খুব গুরুত্বপূর্ণ :**

স্কুল, কলেজ, পাড়া, অফিস, পার্টি অফিস, অন্য কোনও ক্ষেত্রে বন্ধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দেখতে হবে সে কাদের সাথে বেশি মিশত?

বস্তি এলাকার বা পিছিয়ে থাকা এলাকার স্কুলের ছাত্ররা অনেক সময় রেষারেষির চোটে খুন করে দিয়েছে এমন ঘটনাও কারণ ঘটেছে। তারা মহল্লার পরিবেশে হয়তো অপরাধ, খুন ইত্যাদি হামেশাই দেখে। আবার ঘটেছে। প্রেমঘটিত কারণেও খুন হতে পারে। তবে সেখানেও দেখতে পাবেন পরিবেশগত ভাবে একটু একটু করে সে কলেজ পড়ুয়াদের অনেক সময় অ্যাডভেঞ্চার অপরাধী হয়েছে। করতে গিয়ে খুন হতে দেখা যায়। গটআপ কিডন্যাপ করে তারপর মুক্তিপণের টাকার লোভে বন্ধুকেও গুম করে। উঠতি যৌবনের তাড়নায় বন্ধুদের মধ্যে প্রেমঘটিত কারণ বা যৌনতার কারণে অবস্থা জটিল হতে পারে। একসঙ্গে একাধিক প্রেম, অবস্থা সামাল দিতে নাছোড়বান্দা কাউকে খুন করতে পারে। বাজে মেয়ের ব্ল্যাকমেল থেকে বাঁচতে খুন করতে পারে।

* যে পাড়ায় থাকে সেখানে কোনও বন্ধুর সারকেলে মেশে কিনা? থাকলে তাদের ক্যারেক্টারগুলো কেমন? এসব নিয়ে বিশ্লেষণ করলেও খুনের মোটিভ ও খুনিকে চিহ্নিত করা যায়।

* ব্যবসা যদি করে, সেখানে ব্যবসার কারণে ব্যবসায়িক বন্ধু বা পার্টনার থাকলে তারা কীরকম। এটা আরও বেশি নির্ভর করে কী ধরনের ব্যবসা করে তার ওপর। যেমন প্রোমোটিং বা স্মাগলিং ব্যবসায় খুন-খারাপি লেগেই থাকে।

*** পেশা কী?**

ব্যবসা না চাকুরে।

ব্যবসা হলে কি ধরনের ব্যবসা?

বিজনেস? প্রোমোটার? মারুতির কারখানা আছে? দালালি করে? এসব হলে খুনের কারণের সাথে তোলাবাজ ও মেয়েদের চক্কর কাজ করতে পারে। যদি হয় মাছের ভেড়ির মালিক তবে ব্যবসায়িক শত্রুতার কারণে খুন হতেই পারে।

* চাকরি কী করে? সরকারি না বেসরকারি?

বেসরকারি খুব বড় প্রতিষ্ঠান হলে আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘটতে পারে। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাও বড় রকমের চুরি করতে পারে। ইন্টেলিজেন্ট চোর বলা যেতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ও উচ্চমেধাকে কাজে লাগিয়ে সংস্থার কর্মীরা খুব সহজেই বড় ধরনের দুর্নীতি করে থাকে। সাম্প্রতিক উপকরণ লেম্যান ব্রাদার্স থেকে সত্যম। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো বে-আইনি কারবার করেই থাকে। কোম্পানির প্রোডাক্টের আড়ালে

চোরাইমাল এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট করতেই পারে। আর্থিক দুর্নীতি চালাতে পারে। খুব ছোট বেসরকারি সংস্থা ততটা করতে পারে না।

* চাকরি যদি হয় সরকারি, সেখানেও ভাবতে হবে কী চাকরি—

পুলিশ, ডাক্তার, স্কুলটিচার, সেনাবাহিনী, সেলট্যাক্স, ইনকামট্যাক্স, ব্যাঙ্ক, রেল, পোস্টঅফিস, অডিট ইত্যাদি।

প্রত্যেকটি চাকরির দুর্নীতির চরিত্রটা ভিন্নরকম। সি.বি.আই.-এর ডিএসপিকে হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি রাখার অপরাধে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হল। মজাটা হল একজন কনস্টেবল থেকে আই.পি.এস. প্রত্যেকেরই প্রভূত হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি। ব্যতিক্রমী পুলিশ খোঁজা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজার মতো ব্যাপার। মন্ত্রীদের হিসাব বহির্ভূত আয়ের পরিমাণ আকাশছোঁয়া। এখানেও ব্যতিক্রমী খুঁজতে হাঁপিয়ে যাবেন। ডাক্তারটা ওষুধ কোম্পানি থেকে প্যাথলজিকাল ল্যাবগুলোর ঘুষ হিসাবে গাড়ি থেকে বিদেশ ভ্রমণ সবই বাণিজ্য করে, রোগীদের বলি দিয়ে। আর এমন ডাক্তাররাই সংখ্যায় বেশি।

জাতি-ধর্ম বিশেষে মানুষের চরিত্র :

যেমন মুসলিমদের আমরা ধরেই নিই খুব উগ্র। আসলে ওদের মধ্যেও পার্থক্য আছে। যেমন এই বঙ্গের বাঙালি মুসলিম ও অবাঙালি মুসলিম। বাঙালি মুসলিমরা হিন্দু বাঙালিদের সংস্পর্শে থাকার ফলে এরা শান্তিপ্রিয় হয় বাঙালি মুসলিমরা খুব অতিথিপরায়ণ হয়। বিশেষত বাংলাদেশে। অবাঙালিরা যেমন বিহার থেকে এসে ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চল, কলকাতা ও তার আশে-পাশে বাস করছে বহুকাল ধরে। যেমন গার্ডেনরিচ, রাজাবাজার, খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, পার্কসার্কাস ইত্যাদি অঞ্চলে এদের বাস। শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে থাকার কারণে এদের মধ্যে সাধারণভাবে অপরাধ প্রবণতা বেশি।

বাঙালিরা কেমন হয়?

বাঙালিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, উচ্চবিত্ত।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেদের সবচেয়ে দোষ করা নিরাশার ভোগে বেশি। অথচ এদিকে আবার ছুপারুস্তম। অন্যান্য শ্রেণির তুলনায় অনাচারে লিপ্ত হন বেশি। এরা স্বভাবে সবজান্তা, ভণ্ড, স্ববিরোধী, সুবিধাবাদী। নিজের বউ থাকতে তুলসী তলায় বাতি দেওয়া সতী হয়ে। কিন্তু বাইরে টপ্-জিন্স পরিহিত ছিপছিপে, লাস্যময়ী, গায়ে পড়ে যাওয়া মেয়েদের খুব পছন্দ।

উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে একটা মিল আছে। নারী-পুরুষ সমান খাটে। কোনও শরীরী জড়তা নেই। মিলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। নারীরা অনেক বেশি স্বাধীন মধ্যবিত্তদের থেকে।

ড্রাগ অ্যাডিক্ট বুঝবেন কেমন করে

ভীষণ ভালো ছিল পড়াশুনোয়। বয়স ১৪-১৭। হঠাৎ রেজাল্ট খারাপ করতে শুরু করল। কেন? দেখুন ছেলে ড্রাগ অ্যাডিক্ট করে যাচ্ছে না তো?

লক্ষণগুলো কী কী?

১. চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে।
২. রাগ, সন্দেহ প্রবণতা বেড়েছে।
৩. ঝিমিয়ে থাকছে।
৪. স্নান করে না বা কম করে।
৫. ময়লা থাকতে পছন্দ করে।
৬. একসাথে অনেকক্ষণ ছেলেবন্ধুর সাথে ঘরের দন্ধ করে আড্ডা মারে।
৭. টি.ভি.-র চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার অভ্যেস হয়েছে।

এধরনের ছেলেরা সেক্সুয়ালি পার্ভার্টেড হতে থাকে। সমকামী হয়ে ওঠে। মায়ের বয়সি মহিলাদের সাথে সম্পর্ক গড়তে আগ্রহী হয়।

হিজড়ে অপরাধের আঁতুরঘর :

এদের সাথে অপরাধ জগতের যোগাযোগ বেশি। স্মাগলিং গুডস্ পাচার হিজরেদের মাধ্যমেই বেশি হয়। এদের জীবিকার মধ্যে প্রসটিটিউশন চলে। রাত ন-টার পর শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন চত্বরে খদ্দের ধরার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া ধর্মতলায় মেট্রো সিনেমার সামনে, খিদিরপুর এলাকায় এদের দেখা যায়।

যে-কোনও তদন্তের স্বার্থে আরও অনেক তথ্য থাকলে অনুসন্ধান খুব সহজেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের যুক্তিবাদীদের কাছে সেসব তথ্য না থাকলেও যে-কোনও অপরাধের একটা কিনারা করে দিতেই পারি। রাজ্যগোয়েন্দা দপ্তরের মতো তথ্য প্রমাণ লোপাট করি না। সিবিআই-এর মতো ভোটব্যাঙ্ক মাথায় রেখে তদন্ত ঝুলিয়ে দিই না। আসুন পাঠক আমরা আমাদের আগ্রহ, সঠিক বিচার করার ইচ্ছা, সাহস, নিরপেক্ষতাকে, সততাকে ভিত্তি করে অপরাধীকে চিনে নিই।

বিগ ব্যাং নিয়ে গবেষণা

মণীশ রায়চৌধুরী

৮ সেপ্টেম্বর, ২০০৮। ক্লাস ফোরের ছোট্ট সোনিয়া কিছুতেই সেদিন আমার কাছে পড়বে না। কান্না থামিয়ে শান্ত করার পর সে জিজ্ঞাসা করল, "দাদা আমরা সবাই কি মরে যাব?"

বুঝতে পারলাম, গত কয়েকদিনের ব্যাপক প্রচারে সেও জেনে গেছে যে পৃথিবীর 'ধ্বংস' আসন্ন।

শুধু ও নয়, ওই সময় অনেকের মনেই উঁকি দিয়েছিল একই আশঙ্কা। সত্যিই কি 'ব্ল্যাক হোল' গ্রাস করবে পৃথিবীকে? পৃথিবীতে কি সত্যিই ঘটবে 'মহাপ্রলয়'? এই আতঙ্কেই ইন্দোরে ছায়া নামে এক কিশোরী আত্মহত্যা করেছে।

এর পিছনে আছে 'বিগ ব্যাং', 'ব্ল্যাক হোল' প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অস্পষ্ট ধারণা এবং এরই সুযোগে বিভিন্ন মিডিয়ার বিজ্ঞানহীন বিজ্ঞানসাংবাদিকতা, যা মানুষের মনে অকারণ আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

তাই প্রথমেই আমরা ব্রহ্মাণ্ডের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি বিষয়ে দু'টি তত্ত্ব আছে—

বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের 'স্থির দশা তত্ত্ব' এবং 'বিগ ব্যাং তত্ত্ব'। 'স্থির দশা তত্ত্ব' অনুসারে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার পর তার আর কোনও পরিবর্তন ঘটেনি। বিজ্ঞানের আলোকে এই তত্ত্ব তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে।

পরিবর্তে উঠে এসেছে 'বিগ ব্যাং তত্ত্ব' (Big Bang Theory)। এই মতানুসারে—পূর্বে একটি শক্তিপূর্ণ মহাবিশ্ব ছিল। আজ থেকে প্রায় ১৩৭০ কোটি বছর পূর্বে এই 'কসমিক এগ' বিস্ফোরিত হয়। একেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলে 'বিগ ব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণ। এই বিস্ফোরণের পর মুহূর্তেই মহাবিশ্বের উষ্ণতা হয় এক লক্ষ মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এরপর ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান ৪টি বল (Force) অর্থাৎ মহাকর্ষবল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল ও শক্তিশালী নিউক্লিয় বল একত্রিত হয়ে ১টি মাত্র বলে পরিণত হয়েছিল। এর পর সৃষ্টি হয় ব্রহ্মাণ্ডের আদি কণা 'গ্লুয়ন'। গ্লুয়ন থেকে সৃষ্টি হয় কোয়ার্ক ও লেপটন কণা। কোয়ার্ক থেকে সৃষ্টি হয় প্রোটন।

প্রোটন ও ইলেকট্রন সৃষ্টির পরই চারটি বল পুনরায় পৃথক হয়ে যায়। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই ক্রমশ প্রসারণশীল।

১৯৬৫ সালে Cosmic Microwave Background Radiation এই মতকেই প্রমাণিত করেছে।

বিগ ব্যাং এর ৫ লক্ষ বছর পর সৃষ্টি হয় হাইড্রোজেন পরমাণু। এই হাইড্রোজেনই হল বিভিন্ন নক্ষত্রের মূলগঠনগত উপাদান।

'নিউক্লিয় সংযোজন' (Nuclear fusion) পদ্ধতিতে প্রতি সেকেণ্ডে লক্ষ লক্ষ হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে পরিণত হচ্ছে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় প্রচুর পরিমাণ শক্তি। এভাবে কয়েকশো কোটি বছর পর কোনও নক্ষত্রের সকল হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রপান্তরিত হলে সেটি আর শক্তি উৎপাদন করতে পারে না। তখন ঘনিয়ে আসে তার অন্তিম কাল।

এই অবস্থায় নক্ষত্রটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে 'সুপারনোভা'। এভাবেই ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে পৃথিবী থেকে ২৪ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত SN 2006 GY নক্ষত্রটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে গেছিল।

সুপারনোভা না ঘটলে সেই নক্ষত্রটি সাধারণত 'ব্ল্যাক হোল' গঠন করে। এক্ষেত্রে ধ্বংস হওয়ার কিছু বছর পূর্ব থেকেই নক্ষত্রটি নিজের বহিঃস্তরের গ্যাসীয় আস্তরণকে মহাকাশে বিলীন করতে থাকে। এরফলে তার কেন্দ্রের আকর্ষণ বল ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই আকর্ষণ বল কোনও কোনও ক্ষেত্রে এত বৃদ্ধি পায়, যে আলোকরশ্মি পর্যন্ত তার হাত থেকে রক্ষা পায় না। অর্থাৎ আলোকরশ্মি ওই অংশে আপতিত হলে তা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌঁছায় না। তাই এই অঞ্চলকে বলা হয় 'কৃষ্ণগহ্বর' বা Black Hole।

কোন নক্ষত্র সুপারনোভা হবে, না ব্ল্যাক হোল গঠন করবে তা নির্ণয় করেছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানী সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর। তার মতে, কোনও নক্ষত্রের কেন্দ্রে সূর্যের ভরের ১.৪ গুণের বেশি হিলিয়াম জমা হতে পারে না। ওই মাত্রায় হিলিয়াম সঞ্চিত হলে কেন্দ্রের প্রচণ্ড চাপে নক্ষত্রটি বিস্ফোরিত হয়, তৈরি হয় 'সুপারনোভা'।

কিন্তু হিলিয়ামের পরিমাণ ১.৪ গুণের কম হলে গঠিত হয় ব্ল্যাক হোল। একে তারই নামানুসারে বলা হয় 'চন্দ্রশেখরের মাত্রা'।

এই সুবিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিদিনই ঘটছে বহু সুপারনোভা, তৈরি হচ্ছে ব্ল্যাক হোল। এটি একটি অতি স্বাভাবিক মহাজাগতিক ঘটনা।

এভাবে হাইড্রোজেনের জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে আমাদের সূর্যও একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, সাথে সাথে শেষ হবে এই সৌরজগত।

তবে বিজ্ঞানীদের মতে সে-সময় আসতে এখনও অন্তত ৫০০ কোটি বছর বাকি আছে।

আগেই আলোচনা করেছি যে, বিগ ব্যাং-এর প্রায় ৫ লক্ষ বছর পরে হাইড্রোজেন পরমাণু সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা প্রভৃতি মহাজাগতিক বস্তুসমূহ।

কিন্তু, 'কসমিক এগ' কেন বিস্ফোরিত হল? আইনস্টাইনের ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব' থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে বস্তুর ভর ও শক্তি প্রকৃতপক্ষে অবস্থারই রূপান্তরমাত্র। বিগ ব্যাং এর পরে শক্তিপূর্ণ মহাবিশ্বে প্রথম ভরবিশিষ্ট কণা সৃষ্টি হল কেন?

ইলেকট্রন, প্রোটন, মেসন, কোয়ার্ক প্রভৃতি কণার ভরের রহস্য কী?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য জেনিভা শহরের ১০০ মি. গভীর ভূগর্ভে ২০ বছর ধরে ৯০০ কোটি ডলার ব্যয়ে ইউরোপীয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (CERN) তৈরি করেছে মানবজাতির তৈরি সবচেয়ে জটিল যন্ত্র লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (LHC)। বিশ্বের অসংখ্য দেশের প্রায় ৭০০০ জন বিজ্ঞানী এই প্রকল্পের সাথে যুক্ত।

গত ১০ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সকালে পুরু কংক্রিটের দেওয়াল ঘেরা ২৭ কিলোমিটার বৃত্তাকার পরিধি বিশিষ্ট এই যন্ত্রে ছুটতে শুরু করে ঝাঁক ঝাঁক বিপরীতমুখী প্রোটনের স্রোত। এক-একটা ঝাঁকে থাকবে $১০^{১১}$ টি প্রোটন। ঘুরতে ঘুরতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রোটনের স্রোতের বেগ বেড়ে হবে সেকেন্ডে ২৯৯৭৯২.৪৫৫ কিমি. অর্থাৎ আলোর বেগের ৯৯.৯৯৯৯৯৯%। $-২৭১^{\circ}C$ উষ্ণতায় ১০,০০০ এরও বেশি অতি সুপরিবাহী চুম্বকের সাহায্যে এদের নির্দিষ্ট পথে চালিত করা হচ্ছে। আগে ঠিক হয়েছিল ২১ অক্টোবর ৪টি সংঘর্ষ বিন্দুতে বিপরীতমুখী স্রোতের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটানো হবে যার ফলে প্রায় ৭০০০গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট (Gev) শক্তি উৎপন্ন হবে। এই প্রচণ্ড শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র সময়ের জন্য গ্লুয়ন ও কোয়ার্ক কণার সৃষ্টি হবে যা বিগ ব্যাং-এর পরমুহূর্তে সৃষ্টি হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য হিগস্ বোসন কণার অস্তিত্ব প্রমাণ করা। তাদের মতে কোনও পরমাণুর ভরের মূল কারণ ওই কণা।

কিন্তু হিলিয়াম টিউব লিক করায় সে কাজ পিছিয়ে গেছে। সম্ভবত, এবছর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ওই পরীক্ষাটি আবার করা হবে।

কিছু বিজ্ঞানী আশঙ্কা করেছিলেন যে এর ফলে ব্ল্যাক হোল তৈরি হবে ও তা পৃথিবীকে গ্রাস করে নেবে।

কিন্তু সার্নের ডিরেক্টর ড. রবার্ট আইমারের মতে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার সময় যে আঘাত করে তার থেকে এই প্রোটন সংঘর্ষের তীব্রতা অনেক কম। তাই এতে ব্ল্যাক হোল তৈরির কোনওই সম্ভাবনা নেই।

আমরা পরীক্ষাটি চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছি।

আমরা চাই, বিজ্ঞানের ইতিহাস নতুন করে লেখা হোক।

যুক্তিবাদ
জয়যুক্ত হবেই

—শুভার্থী

মানুষের একটাই ধর্ম 'মনুষ্যত্ব'
যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্ট্স
অ্যাসোসিয়েশনের জয়যাত্রা
কামনায় শুভার্থী

যে কোনও অনুষ্ঠান মাতাতে
জাদুকর সৌম্যদেব ও তার ইন্দ্রজাল
A-S-7/3/11, Kalyanpur Housing
P.O. - Asansol ● Ph. 9232690311

মানবতাবাদী আন্দোলনের জয় ঘোষিত হবেই
শুভার্থী

সংগঠন সংবাদ : ২০০৮-৯

✶ ১-১০ মার্চ : 'বইমেলা ২০০৮'-এ 'আমরা যুক্তিবাদীরা' যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে ছিলাম।

✶ ৯ মার্চ : 'পৃথক গোর্খাল্যান্ড'-এর দাবির সমর্থনে বইমেলায় যুক্তিবাদী সমিতি ও হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশন-এর পথসভা। 'ইউ.বি.আই. অডিটোরিয়াম-এর সামনে। প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা 'এন.ই. বাংলা', 'কলকাতা টিভি' ও অন্যান্য পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেন।

✶ ১২ মার্চ : কলকাতা টিভি-র 'জিরো আওয়ারে' প্রবীর ঘোষের লাইভ অনুষ্ঠান। বিষয় : সম্মোহন, হাতে কলমে সম্মোহন করে দেখান ও দর্শকের প্রশ্নের উত্তর দেন প্রবীর ঘোষ।

✶ ৩০ মার্চ : যুক্তিবাদী সমিতির বারাকপুর শাখার প্রথম মিটিং-এ প্রবীর ঘোষ, সুমিত্রাদি উপস্থিত হন। উপস্থিত ছিলেন শাখার মোট বারোজন।

✶ ১৮-২০ এপ্রিল : ব্যারাকপুরের চককাঁঠালিয়ার মাঠে 'শিশু উৎসব'-এ শাখার তরফ থেকে 'বুক স্টল' দেওয়া হয়।

✶ ২৩ এপ্রিল : চিত্তরঞ্জনে ডাইনি হত্যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান কাজোড়া শাখার সেক্রেটারি রঞ্জুর নেতৃত্বে একটি দল আসানসোল মহকুমা অফিসে অভিযোগ ও গ্রেপ্তারের দাবি জানালেন।

✶ এপ্রিল-জুন : 'কৈশোরক' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় 'আমার কৈশোর'-এ প্রবীর ঘোষের ছোটবেলার কথা ও সুমিত্রাদির লেখা ছাপা হয়েছে।

✶ বাংলা নববর্ষ পালন করল উৎসবের মধ্যে দিয়ে, উত্তর চব্বিশ পরগনার **হাবড়া** শাখা এবং বর্ধমানের **কাজোড়া** শাখা—১৩ ও ১৪ এপ্রিল ২০০৮।

✶ দোল উৎসবে জন্ডিস নিয়ে সচেতনতা ক্যাম্প করল বাঁকুড়ার **বেলিয়াতোড়**। মাটির মূর্তি গড়ে ট্যাবলো তৈরি করেছিল তারা এই উপলক্ষ্যে।

✶ ১৭ মে : 'হেডলাইনস টুডে' চ্যানেলে রাত ৮টা থেকে ৮:৩০ পর্যন্ত 'Sex Swindle and a Swami' (যৌন প্রতারণা ও এক স্বামীজী) নামক লাইভ প্রোগ্রামে সুমিত্রা পদ্মনাভন অংশগ্রহণ করেন।

✶ ১৮ মে : উপরের অনুষ্ঠানটি দুপুর ১.৩০-২ টা পর্যন্ত এবং ৪ থেকে ৪:৩০ পর্যন্ত পুনঃপ্রচার করা হয়।

✶ ৯ জুন : 'জ্যোতিষশাস্ত্র এবং...' বিষয়ে প্রবীর ঘোষের ইন্টারভিউ 'হিন্দুস্তান টাইমসে' প্রকাশিত হয়।

✶ ১০ জুন : 'জ্যোতিষশাস্ত্রের' বিরুদ্ধে প্রবীর ঘোষের সাক্ষাৎকার 'ইন্ডিয়া টিভি'-তে প্রচার করা হয়।

✶ ২৮ জুন : 'সাপ ও কুসংস্কার' বিষয়ে প্রবীর ঘোষের সাক্ষাৎকার ফরচুন চ্যানেলে দেখানো হয়।

✶ ৮ জুলাই : প্রবীর ঘোষ ও আসামের গোয়ালপাড়া শাখার প্রচেষ্টায় 'মেমারিম্যান' বিশ্বরূপ রায়চৌধুরীর অনুষ্ঠান ভেঙে গেল।

✶ ১৪ জুলাই : শিলিগুড়ি-তে 'বিবিসিএন' কেবল চ্যানেলে 'লাইভ' 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' শিরোনামের অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবীর ঘোষ।

✶ ২৬ জুলাই : প্রবীর ঘোষ ও নদিয়া জেলার কালিগঞ্জ শাখার হাতে এক 'তান্ত্রিকে'র ভান্ডাফোড়।

✶ ৪ সেপ্টেম্বর : "বাড়িতে ভূত পোষা'র শাস্তি : পরিবারকে বয়কট শালবনিতে" এই ঘটনার বিরুদ্ধে কেন্দ্র কমিটির সন্তোষ, সুমন ও মিদনাপুর শাখার অনিন্দ্যসুন্দর ও জনাছয় মিলে গ্রামে গিয়ে অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠান করে ও সমস্যার সমাধান হয়।

✶ ৫ সেপ্টেম্বর : উপরের ঘটনার বিস্তারিত খবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'বর্তমানে' প্রকাশ করা হয়।

✶ ৬ সেপ্টেম্বর : '২০১২ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে' এর ওজর যুক্ত সিডির বিরুদ্ধে যুক্তিবাদী সমিতির পুরুলিয়া শাখা জেলা পুলিশ ওই অতিরিক্ত জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেয়।

খবর : 'সংবাদ প্রতিদিন'-এ প্রকাশিত।

✶ ৯ সেপ্টেম্বর : নদিয়ার কালিগঞ্জ শাখার সদস্যরা 'কার্তিক সাধু' যাদব নামে এক তান্ত্রিকের ভান্ডাফোড় করেন।

✶ ১১ সেপ্টেম্বর : Humanists Association-এর ১৫ তম জন্মদিন উপলক্ষে বিভিন্ন শাখায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল।

✶ ৫ অক্টোবর : 'তিমিরবিনাশী' নামে প্রবুদ্ধ বাগচির তৈরি দুটি সিডিতে প্রবীর ঘোষের সাক্ষাৎকার দেখা হ'ল হিউম্যানিস্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় অফিসে।

✶ ৩০ অক্টোবর : ব্যারাকপুরের রবীন্দ্রপল্লীতে 'খেলাঘর' সংঘের পরিচালনায় শাখার তরফ থেকে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক অনুষ্ঠান' উপস্থিত কেন্দ্র ও শাখার সম্পাদক ও সদস্যরা।

✶ ৭ ডিসেম্বর : 'মুম্বই জঙ্গি হানা'-র উপর প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রাদির ইন্টারভিউ নেয় দৈনিক বিশ্বামিত্র।

✶ ২৮ ডিসেম্বর : ধান্যকুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার (বসিরহাট) দ্বারা শিশু উৎসবে প্রবীর ঘোষ পরিচালিত 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান। উপস্থিত সমিতির সুমিত্রাদি, সন্তোষ, মানসী, সুদীপ ও রাজা।

✶ ৩০ ডিসেম্বর : 'খড়দহ-এর রহড়ায় এক বাড়িতে ভূতের উপদ্রব'। কলকাতা টিভিতে বিকেল ৫:৩৫ থেকে ৬ টা 'লাইভ' অনুষ্ঠানে 'প্রবীর ঘোষের মতামত (ফোনে) প্রচার করা হয়।

✶ ৯ জানুয়ারি ২০০৯, বাঁকুড়া বইমেলার শেষ দিনে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান তুমুল জমিয়ে দিল বিপ্লব দাস, তুষার লায়েক ও প্রশান্ত মণ্ডল। একটি লাইব্রেরি তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। ৩০০-৪০০ জন সদস্য যোগ দিয়েছেন এখনই। সারাঙ্গাপুর মহামায়া লাইব্রেরির উদ্বোধন হবে ফেব্রুয়ারির শুরুতে।

✶ ১১ জানুয়ারি ২০০৯ : শেওড়াফুলির ছিনামোড় অঞ্চলে 'ছাগবলি নিবারণ কমিটির' সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রবীর ঘোষ, সুমিত্রাদি ও মানসী। অঞ্চলের মানুষরা গত কয়েক বছর ধরে দক্ষিণদ্বয় কালীমন্দিরে পশুবলি বন্ধের চেষ্টা করছেন। ১৭১টি সই জোগাড় হয়েছে যুক্তিবাদী সমিতির দিলীপ দাসের নেতৃত্বে। সভার আয়োজন দিলীপই করেছে। খুব সুন্দর আলোচনা সভায় যোগ দিয়েছেন গৌতম, পরেশ দাস মণ্ডল, শিক্ষক বসন্ত কোলে-সহ জনা পঞ্চাশেক উৎসাহী স্থানীয় মানুষ। সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষক বিভূতিভূষণ নিয়োগী। বক্তাদের বলির বিরুদ্ধে যুক্তি, আবেদন, প্রবীরদার শাস্ত্র বিষয়ে ব্যাখ্যা স্থানীয় মানুষের বলির বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করেছে। দিলীপকে অভিনন্দন।

অভিষেক

ম্যারেজ হাউস

বর্ধমান শহরের গর্ব

(সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সামনে)

ফোন (0342) 2565982

শ্রদ্ধেয়া সুমিত্রাদি,

সাম্প্রতিক সংখ্যা 'যুক্তিবাদী' প্রবীরদার কাছ থেকে পেয়ে পড়ে ফেলেছি। আপনার জন্য এককপি 'কৈশোরক' প্রবীরদার কাছে রেখে এসেছি, হয়তো পেয়ে গেছেন।

'যুক্তিবাদী' বিষয়ে মতামত জানাতে প্রবীরদা অনুরোধ করেছিলেন, তাই বিনীতভাবে দুই-একটা কথা বলি। পত্রিকার এই সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে সুসম্পাদিত। আপনার নার্কোটেস্ট বিষয়ক লেখা বা অরুন্ধতী রায়ের এবং আপনার যুগ্ম লেখা বেশ ভালো (যদিও অরুন্ধতী রায়ের সব মতের সঙ্গে আমি একমত নই, তবে এটা স্বতন্ত্র প্রশ্ন)। তবে ছাপার ভুলের বিষয়ে এবারে যে আপনারা বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন সেটা বুঝতে পারলাম কেননা এবারের পত্রিকায় ভুল অনেকটাই কম।

'প্রশাসন' লেখাটিতে একটি ছোট্ট তথ্যগত ত্রুটি রয়েছে : ১৩ নং লাইনে বলা হয়েছে' সরকারের বিভিন্ন দফতরের সচিব, ইনকামট্যাক্স কমিশনার, জেলা জজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে এঁরাই বসেন। আই এ এস বা আই আর এস সার্ভিসের প্রশাসকরা জেলা জজের পদে বসেন বলে আমার জানা নেই। রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন যে জুডিসিয়াল সার্ভিসের পরীক্ষা নেন, তাতে যারা সফল হন তারাই বিচারপতি হিসেবে নিয়োজিত হন। আর মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যরা কি পাবলিক সার্ভেন্ট না পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ? এটা নিয়ে আমারও সংশয় হচ্ছে। প্রবীরদাকে বলবেন একটু বই দেখে নিতে। তবে আপনার পত্রিকার এবারের চোখ কাড়া আইটেম কার্টুনটি একেবারে পেছনের পাতায় কেন? ওটা সামনে দিলেই বোধহয় ভালো হত। ভালো থাকুন।

স্নেহের
প্রবুদ্ধ বাগচী

প্রধান সম্পাদকের বক্তব্য : জুডিসিয়াল সার্ভিসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা বিভিন্ন কোর্টে বিচারকের পদে বসেন। এঁরা হলেন ম্যাজিস্ট্রেট। আবার আই.এ.এস., বি.সি.এস.-রাও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, অ্যাডিশনাল ডি.এম. ইত্যাদি পদে নিয়োজিত হন। শুধু পশ্চিম বাংলায় যতজন ডি.এম. আছেন, তাঁদের বেশিরভাগই আই.এ.এস. এবং এক তৃতীয়াংশেরও কম ডব্লু.বি.সি.এস.।

মুখ্যমন্ত্রী থেকে মন্ত্রীসভার প্রত্যেক সদস্যই যে 'পাবলিক সার্ভেন্ট', সে বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের একটা স্পষ্ট রায় আছে। রায়টির অংশবিশেষ তুলে দিলাম।

VI. DECISIONS
(191)

Public Servant
Chief Minister or Minister is a public servant within the meaning of section 21 Indian Penal Code.

M. Karunanidhi vs. Union of India
AIR 1979 SC 898

The appellant was a former Chief Minister of Tamilnadu. A criminal case was registered against him and investigated by the Central Bureau of Investigation and a charge sheet was laid before the Special Judge for Special Police Establishment Cases under sec. 161 IPC (corresponding to sec 7 of P/C. Act, 1988), secs 468 and 471 I.P.C. and section 5(2) read with section 5(1)(d) of P.C. Act 1988) after obtaining sanction of the Governor of Tamilnadu under section 197 Cr. P.C. ...

...The Supreme Court further held that the provision of Arts 164 and 167 of Constitution reveals : (i) that a Minister is appointed or dismissed by the Governor and is, therefore, subordinate to him whatever be the nature and status of his constitutional functions, (ii) that a Chief Minister or a Minister gets salary for the public work done or the public duty performed by him and (iii) that the said salary is paid to the Chief Minister or the Minister from the Government funds. It is thus incontrovertible that the holder of a public office such as the Chief Minister is a public servant in respect of whom the Constitution provides that he will get his salary from the Government Treasury so long as he holds his office on account of the public service that he discharges.

The Supreme Court further held that the use of the words 'other public servants' following a Minister of the Union or of a State in section 199(2) Cr. P.C. also clearly shows that a Minister would also be a public servant as other public servants contemplated by the section, as Criminal Procedure Code is a statute complementary and allied to the Penal Code.

With Best Compliments from :

A well Wisher

ধান্যকুড়িয়ার শিশু উৎসব

গত ২৮ ডিসেম্বর বসিরহাটের ধান্যকুড়িয়াতে 'অলৌকিক নয়, লৌকিক' অনুষ্ঠান হল—ধান্যকুড়িয়া সাধারণ পাঠাগার আয়োজিত শিশু উৎসব ২০০৮ (২৩-২৮ ডিসেম্বর) এর অঙ্গ হিসাবে।

ধান্যকুড়িয়া জমিদার বাড়ির কাছেই এই পাঠাগারটি জমিদার বাড়িরই একাংশে স্থাপিত। অসম্ভব সুন্দর, সুপরিচালিত এই পাঠাগারটিতে প্রচুর বই, সংলগ্ন মাঠে বইমেলা, মঞ্চে শিশু উৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান—সবই অত্যন্ত সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করছেন স্থানীয় কৈলাস সাউ। কৈলাসবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরে কাজ করেন। অঞ্চলে নিয়মিত আই-ক্যাম্প, রক্তদান শিবির ইত্যাদির আয়োজন করেন নিজের উদ্যোগে। বাৎসরিক এই শিশু উৎসবেরও পুরোভাগে থাকেন তিনিই। বললেন—"১ থেকে ১০ বছরের শিশুদের স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা হয় প্রতি বছর, পুরস্কার দেওয়া হয়। তাতে মায়েরা শিশুদের শরীর-স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও সচেতন হন।"

যুক্তিবাদী সমিতির প্রবীর ঘোষ, মানসী, সন্তোষ, সুদীপ ও রাজা অনুষ্ঠান জমিয়ে দেয়। প্রচুর ভিড় হয়েছিল। বাচ্চাদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রতি বছর এই মেলায় হাজির থাকতে রাজি যুক্তিবাদীরা।

ভারতে এখনও একজনও বার্ড-ফ্লু-তে মারা যায়নি

অথচ যত্রতত্র মুখ বাঁধা, গ্লাভ্স পরা খুনী বাহিনী হাজির হয়ে চড়াও হচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামের পোলট্রি ফার্মগুলোতে। বেশিরভাগই অতি দরিদ্র গ্রামবাসীরা এই পোলট্রির মালিক। মহিলারা স্বনির্ভর হতে মুরগি বা ডিম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। তারা যে-কোনও পোষা প্রাণীর মতোই স্নেহে এই মুরগিদের পালন করেন। চোখের সামনে, শিশুদের উপস্থিতিতে সরকারি মুরগি-নিধন বাহিনী পোলট্রির খাঁচা থেকে মুরগিদের বার করে ডানা ছিঁড়ে, গলা মুচড়ে হত্যা করছে ও ওখানেই মাটিতে পুঁতে দিচ্ছে।

মহিলারা মাথা চাপড়াচ্ছেন, অসুস্থ হয়ে জ্বর এসে যাচ্ছে অনেকের। ছেলেমেয়েরা কান্নাকাটি করছে। বিকল্প জীবিকার অভাবে ঠোঙা তৈরি বা ওই ধরনের কাজে আয় হচ্ছে সামান্যই। অঞ্চলের অর্থনীতিটাই ধসে যাচ্ছে। কবে এইসব পরিবারগুলো ক্ষতিপূরণ পাবে—আদৌ পাবেন কি না জানা নেই। এগুলো বললেন বারুইপুর অঞ্চলের কর্মরতা এক শিক্ষিকা।

হ্যাঁ, চীন ও ইন্দোনেশিয়াতে এক-দু'জন মুরগিবাহিত অসুখে মারা গেলেও ভারতে বার্ড-ফ্লুতে মৃত্যুর সংখ্যা এখন অবধি শূন্য।

এটা কী হচ্ছে?

এটা কি কোথাও মাত্রাছাড়া, অযৌক্তিক ও নেতিবাচক পদক্ষেপ বলে মনে হচ্ছে না?

এ বিষয়ে আরও তথ্য ও পাঠকের মতামত চাইছি।

বইমেলায় বিস্ফোরণ :

গেরিলা যুদ্ধের A to Z থেকে আজাদি

প্রবীর ঘোষ ও সুমিত্রা

গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে মাও থেকে চে প্রমুখ অনেকেই বই লিখেছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের অনেক তত্ত্বই আজ আর ততটা প্রাসঙ্গিক নয়। গেরিলা যুদ্ধের আধুনিকতম প্রয়োগ দেখা গেছে নেপালে, শ্রীলঙ্কায় ও ভারতের কিছু অঞ্চলে। কী সেই যুদ্ধের প্রয়োগ কৌশল? আধুনিকতম সমস্ত রকমের প্রয়োগ কৌশল নিয়ে এই গ্রন্থ। আছে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা।

'আজাদি'-তে আছে ২০টি ফিচার। মননশীল, বিশ্লেষণধর্মী এই ফিচারে আছে নার্কো টেস্ট, স্বেচ্ছামৃত্যু, নারী স্বাধীনতা, মেয়েদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার রেসিপি থেকে মণিপুর, কাশ্মীর ও ছত্তিশগড়ে বীভৎস মানবাধিকার লঙ্ঘনের নিত্যকার ঘটনা। দুই মলাট বন্দি বই দু'টিতে পাবেন উত্তরণের দিশা।

যুক্তিবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ

প্রবীর ঘোষ-এর

মেমারিম্যান থেকে মোবাইলবাবা ১০০

মেমারিম্যান বিশ্বরূপ রায়চৌধুরী স্মৃতিধর এবং বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী। একবার শুনেই নাকি মুখস্থ করে ফেলেন ৭০-৮০ হাজার শব্দের ডিকশনারী। সত্যিই কি তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী? নাকি কৌশলে বোকা বানাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে? আমাদের পরীক্ষায় ১৫-২০টি শব্দও মনে রাখতে পারছিলেন না? জানতে চান? রুদ্ধশ্বাস কাহিনি।

প্রবীর ঘোষের অন্যান্য বই

প্রসঙ্গ সন্ত্রাস এবং...১২৫

'প্রসঙ্গ সন্ত্রাস'-এ এনেছেন 'সন্ত্রাস'-এর নানা সংজ্ঞা। কী বলছে উইকিপিডিয়া, রাষ্ট্রসংঘ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ? 'নেপাল' প্রবন্ধে এসেছে মাওবাদীদের সশস্ত্র সংগ্রাম, তাদের গেরিলাযুদ্ধের তাত্ত্বিক ও প্রয়োগের খুঁটিনাটি। বিশ্লেষণ করেছেন ভারতের নানা জ্বলন্ত সমস্যা।

প্রসঙ্গ : প্রবীর ঘোষ

"অন্ধতা ও মূঢ়তার বিরুদ্ধে, অলীক বিশ্বাসের নামে প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে সে একা একটি সৈন্যদল।...এই কাজে প্রবীরের প্রাথমিক প্রেরণা এবং মূল্যবান নেতৃত্ব ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে।"

— ড. পবিত্র সরকার।

অলৌকিক নয়, লৌকিক

মনের নিয়ন্ত্রণ যোগ-মেডিটেশন১২৫

(১ম) ১৬০ (২য়) ১২৫ (৩য়) ২০০ (৪র্থ) ১২৫ (৫ম) ১০০

দে'জ পাবলিশিং ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ ফোন : 2219-7920
Fax : 2219-2041 e-mail : deyspublishing@hotmail.com

প্রধান সম্পাদক : সুমিত্রা পদ্মনাভন। সম্পাদক : মানসী, সন্তোষ, মৃণাল
ঠিকানা : ৭২/৮, দেবীনিবাস রোড, কলকাতা-৭৪, ফোন : (০৩৩) ২৫৫৯-০৪৩৫
● e-mail : prabir_rationalist@hotmail.com ●
website : www.prabirghosh.tk, www.thefreethinker.tk, www.juktibadi.tk
কলকাতা অফিস : ৩৩এ ক্রিক রো, মৌলালী, কলকাতা-১৪ থেকে প্রবীর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
স্টার লাইন : ১৯এইচ/এইচ/১২এ গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬ থেকে সুমন রায় কর্তৃক মুদ্রিত

আমরা যুক্তিবাদী

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি এবং হিউম্যানিস্টস অ্যাসোসিয়েশন-এর মুখপত্র

বইমেলা সংখ্যা জানুয়ারি ২০০৯ দাম : ২৫ টাকা

যুক্তিবাদী সমিতি ২৫ শে পা

আদিবাসী সমাজ ও আন্দোলন
ছত্তিশগড়ের রিপোর্ট
আমেরিকার নির্বাচন পদ্ধতি
হোমিওপ্যাথি কি বিজ্ঞান?
অপরাধী চিনতে
সুস্থ কাম